বিশেষ সংখ্যা

আগস্ট ২০২২ ▪ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

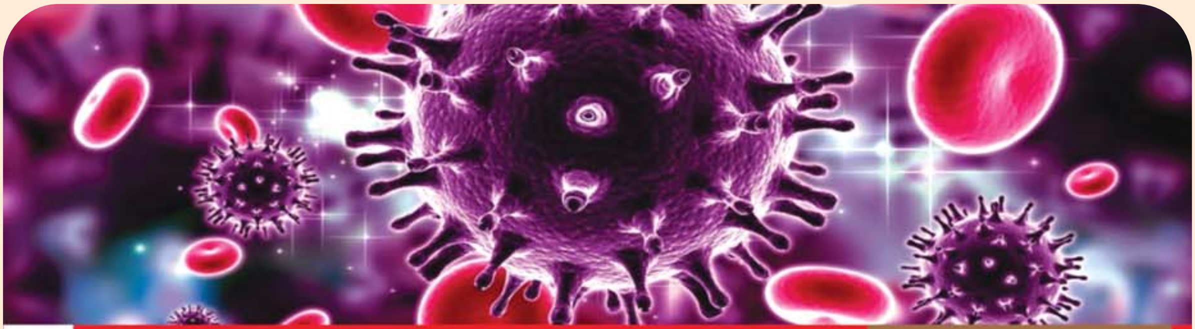

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

আগস্ট ২০২২ ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৯

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

– অন্নদাশঙ্কর রায়

সম্পাদকীয়

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির জন্য এক বেদনাবিধুর দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে কলঙ্কময় দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও ঘনিষ্ঠজন এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এসময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পান। ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীনরা বিচারের পথ বন্ধ করে রাখে। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর এই ঘৃণ্য, জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ সুগম হয়। স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়া শেষে অভিযুক্তদের মধ্যে ৫ জন ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি এবং ২০২০ সালের ১২ই এপ্রিল আরও একজন খুনির ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়। এর মাধ্যমে জাতি কিছুটা দায়মুক্ত হয়। ঘাতকদের অনেকেই এখনও বিদেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পলাতক অভিযুক্তদের যথাযোগ্য শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে জাতিকে কলঙ্কের বোঝা থেকে মুক্ত হতে হবে। এই হত্যাকাণ্ড নিছক ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র নয়। জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে মূলত এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের অর্জন তথা বাংলাদেশকে হত্যা করা হয়েছিল। স্বাধীনতা ও দেশবিরোধী অপশক্তিরা এখনও সক্রিয় রয়েছে। ৪৭তম জাতীয় শোক দিবসে এই অপশক্তি প্রতিরোধের শপথ নিতে হবে। একই সাথে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্টে শাহাদতবরণকারীদের প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে সচিত্র বাংলাদেশ আগস্ট ২০২২ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

৮ই আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছার ৯২তম জন্মবার্ষিকী। ২০২১ সাল থেকে দিবসটি জাতীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সর্বদা বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে বেগম মুজিব কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, দূরদর্শী চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মহীয়সী নারী ফজিলাতুন নেছার এই অসীম ত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তাকে বঙ্গমাতার মর্যাদায় আসীন করা হয়েছে। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'মহীয়সী বঙ্গমাতার চেতনা অদম্য বাংলাদেশের প্রেরণা'। বঙ্গমাতার স্মরণে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

৭ই আগস্ট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম মৃত্যুবার্ষিকী। এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী ২৯শে আগস্ট ২০২২। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মরণে এ সংখ্যায় রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ।

এছাড়া গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যাটি। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

DFP

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

আমরা যেন নিরন্তর বঙ্গবন্ধুর কথা বলি ৪
প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

'শোক' এখন 'শক্তি'র অনির্বাণ উৎস ৬
মোনায়েম সরকার

বঙ্গবন্ধুকে নয়, সেদিন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকেই হত্যা করা হয় ৮
জাফর ওয়াজেদ

জাতীয় শোক দিবসে একটি ক্ষুদ্র বীক্ষণ ১১
প্রফেসর ড. মো. নাজমুল হক

***আমার দেখা নয়াচীন*: বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ভাবনা** ১৪
প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

***অসমাপ্ত আত্মজীবনী*: ইতিহাসের পুনর্পাঠ** ১৯
মফিদুল হক

দাওয়াল বিদ্রোহে বঙ্গবন্ধুর অবদান ২১
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪
অনুপম হায়াৎ

আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির রূপকার শেখ মুজিব ২৬
কালী রঞ্জন বর্মণ

বঙ্গবন্ধুর মানবিকতা ৩০
সৈয়দা নাজমুন নাহার

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা ৩৩
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব: সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক ৩৬
শামস সাইদ

বঙ্গবন্ধু হত্যায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ৩৮
মোহাম্মদ শাহজাহান

নজরুলের শিশুসাহিত্য ৪৫
ইফ্‌ফাত আরা দোলা

পঞ্চগড় ও মাগুরা জেলাসহ ৫২টি উপজেলাকে গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা ৪৭
কে সি বি তপু

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে মাতৃদুগ্ধ ৫৭
সাবিহা শিমুল

***ধানমন্ডি ৩২*: রাজনৈতিক ও পারিবারিক আবহে উপন্যাসের শিল্প বিস্তার** ৫৮
মোজাম্মেল হক নিয়োগী

গল্প

আমার বাবা ৪১
সিরাজউদ্দিন আহমেদ

একাত্তরের মা-জননী ৫০
সুজন বড়ুয়া

পাগল ৬১
আবুল কালাম আজাদ

কবিতাগুচ্ছ ৪৩-৪৪, ৫৫-৫৬, ৬৩

সোহরাব পাশা, আ. শ. ম. বাবর আলী, মিলন সব্যসাচী, গোলাম নবী পান্না, বাবুল তালুকদার, চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু, কামাল বারি, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, আলম নজরুল, উৎপলকান্তি বড়ুয়া, ইজামুল হক, দেবকী মল্লিক, শাহাদত হোসেন সুজন, ফয়সল আহমেদ, হাফিজ রহমান, মিয়াজান কবীর, আবু জাফর আবদুল্লাহ, ইসলাম জবা, অদ্বৈত মারুত, ওয়াসীম হক, রনি অধিকারী

ছড়াগুচ্ছ ৬৪

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান, শাকিব হুসাইন, মোহাম্মদ অংকন, ফরিদ আহমেদ হৃদয়

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৬৫
প্রধানমন্ত্রী ৬৬
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬৭
আন্তর্জাতিক ৬৮
উন্নয়ন ৬৮
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৯
শিল্প-বাণিজ্য ৬৯
শিক্ষা ৭০
বিনিয়োগ ৭১
নারী ৭১
সামাজিক নিরাপত্তা ৭২
কৃষি ৭২
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭৩
স্বাস্থ্যকথা ৭৪
নিরাপদ সড়ক ৭৪
বিদ্যুৎ ৭৪
যোগাযোগ ৭৫
কর্মসংস্থান ৭৬
সংস্কৃতি ৭৬
চলচ্চিত্র ৭৭
মাদক প্রতিরোধ ৭৭
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৮
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৮
প্রতিবন্ধী ৭৯
ক্রীড়া ৭৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলম খান চলে গেলেন ৮০

হাইলাইটস

শোক থেকে শক্তি

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বাবা-মায়ের আদরের সন্তান খোকা বাঙালি জাতির মুক্তির রাজনীতি করতে করতেই একদিন হয়ে ওঠেন শেখ মুজিব, শেখ সাহেব, মুজিব ভাই ও বঙ্গবন্ধু। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধই তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত করেছে। বাংলার জনপ্রিয় সংগ্রামী নেতা ও স্বাধীনতার সিংহপুরুষ বঙ্গবন্ধু দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আপোশহীন নেতৃত্বগুণেই কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌম বাংলাদেশ উপহার দিয়ে জাতির পিতায় পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি ও বাংলাদেশ– একইসূত্রে গ্রথিত, একটি অন্যটির পরিপূরক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ, সাহস, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা করেছেন। তিনি সহধর্মিণী হিসেবে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কাজের প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা সপরিবার শহিদ হন। বিদেশে থাকায় বেঁচে যান তাঁদের দুই কন্যা– বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও মৃত্যু– এই দুই সত্যকে এক করে আগস্ট মাস প্রবলভাবে অর্থবহ। তিনি নেই কিন্তু বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে তাঁর স্পর্শ ও আদর্শ। তিনিই আমাদের পাথেয়। তিনি আছেন সহায়ক শক্তি হিসেবে গণমানুষের চেতনায়। তাঁর আদর্শে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শোক যে শক্তির উৎস হয়, বাংলাদেশ তার প্রমাণ। তাঁর 'জয় বাংলা' ধ্বনি বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করত এবং করছে। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বজ্রকণ্ঠে তাঁর স্বাধীনতার ডাক– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' যেমন মুক্তিসংগ্রামে অনুপ্রেরণার নিরন্তর উৎস, তেমনি পঁচাত্তর-উত্তর স্লোগান– 'এক মুজিব লোকান্তরে, লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে' বাংলার আকাশ-বাতাসকে কাঁপিয়ে উদ্ভাসিত করত বাঙালিকে। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবল বাংলার ইতিহাসের অংশই নন, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসেও তিনি কালের বরপুত্র। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সঙ্গে বাঙালি জাতির উত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেমন অবিচ্ছেদ্য, তেমনি বিশ্বের নিপীড়িত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষেরও তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা। এজন্যই বঙ্গবন্ধু অমর ও চিরঞ্জীব। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও তাঁদের পরিবার নিয়ে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা ৪-৪০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

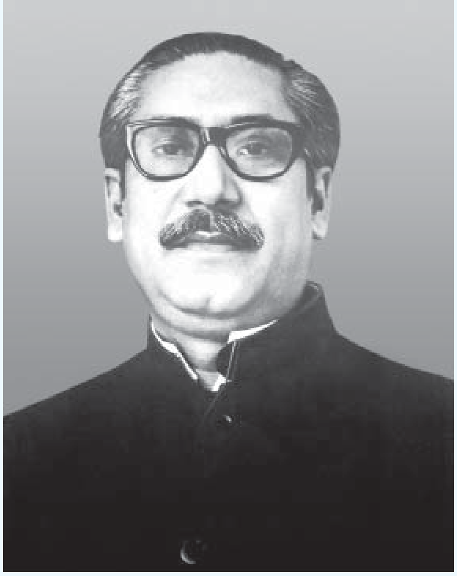

আমরা যেন নিরন্তর বঙ্গবন্ধুর কথা বলি

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান

শোকের এই মাসে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি খুবই বেদনাহত থাকে। কবিরা অন্তর্যামী। তাঁরা আমাদের মনের কথা জানতে পারেন। তাঁরা আগামীর কথাও নান্দনিকভাবে বলতে পারেন। প্রকৃতির মনের কথাও তাঁরা বুঝতে পারেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের প্রাণের বিষয়। কেননা তিনিই যে বাংলাদেশ। আর সেই বাংলাদেশের নদী, সমুদ্র, পাহাড়, গাছ, পাখি ও বিশাল সবুজ প্রান্তর নিরন্তর তাঁকেই স্মরণ করে। সে কারণেই বিশ্বাসঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরপরই এই বলে দুঃসাহস দেখাচ্ছিল যে তিনি কেউ নন। সময়টা ছিল নিকষ কালো। বাংলাদেশ চলছিল মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনার উলটো দিকে 'অদ্ভুত এক উটের পিঠে'। এর উত্তরে কবি মহাদেব সাহা 'এই নাম স্বতোৎসারিত' নামের একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার বরাত দিয়ে তিনি ঐ কবিতায় লিখেছিলেন– 'তিনি বাংলাদেশের হৃদয়।' আর আগস্টের সেই কালরাতে ঘাতকেরা সেই বাংলাদেশের হৃদয়কেই গুলিবিদ্ধ করেছিল। সেই বুক থেকে বয়ে যাওয়া পবিত্র রক্ত সারা বাংলার প্রকৃতির বুককে রক্তাক্ত করেছিল। সে রক্তধারা আজও বয়ে চলেছে নিরবধি। আর সে কারণেই কবির উচ্চারণ ছিল:

> তুমি এই বাংলার নদী, বাংলার সবুজ প্রান্তর
> তুমি এই চর্যাপদের গান, তুমি এই বাংলা অক্ষর,
> বলে ওরা, তুমি কেউ নও, কিন্তু তোমার পায়ের শব্দে
> নেচে ওঠে পদ্মার ইলিশ।

প্রায় একই ভাষায় ঐ অন্ধকার সময়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি' কবিতায় করেছিলেন সাহসী উচ্চারণ:

> সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি,
> রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ
> গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের
> কথা বলি।

কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতায় বলেছেন তাঁর 'নামের ওপর কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া।' তিনি আরও লিখেছেন– 'যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয়/ জ্যোৎস্নার সারস'। প্রকৃতি কতই না সদয় তাঁর প্রতি। কেননা তিনিই যে বাংলাদেশের আরেক নাম। আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। তিনি বাঙালি জাতির পিতা। মানুষ ভালোবেসে তাঁকে জনউপাধি দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু । এই নাম তাই আমাদের সামাজিক জীবনের অংশ। সততই এই নাম নানাভাবে হয় উচ্চারিত। প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে তিনি বেঁচে আছেন আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে। তিনি চিরকালই বেঁচে থাকবেন 'বাংলাদেশের হৃদয়' হিসেবে। কবি মহাদেব সাহার কথাই ঠিক। 'লিখি বা না লিখি শেখ মুজিব বাংলা ভাষায় প্রতিটি নতুন কবিতা।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'মুজিব গোলাপ হয়ে ফোটে, লাল পদ্ম হয়ে ফোটে হৃদয়ে হৃদয়ে।' কেউ চাইলেই কি সেই হৃদয়কে অস্বীকারের উপায় আছে? তিনি যে রয়েছেন সর্বত্র। কেননা তিনি যে আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ।

তিনি তাঁর নান্দনিক নেতৃত্বের গুণে বাংলাদেশের এবং বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও উন্নয়নের সংগ্রামে ভরসার ছায়া হয়ে আছেন। সংগ্রামী এই রাজনৈতিক শিল্পীর ক্যানভাসে উদ্ভাসিত হয়ে আছে বাংলাদেশ নামক এক রঙিন মানচিত্র। এই শিল্পীর ক্যানভাসে লেপ্টে আছে মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, মুক্তিসংগ্রাম এবং দরদি নেতৃত্বের অসামান্য সব প্রতিচ্ছবি। শুধু কথায় নয়। তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মবীর। চিন্তা ও কর্মের এমন সাযুজ্য সত্যি অবাক করার মতো। একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। সেই দেশটিকে কী করে সমৃদ্ধ এবং জনবান্ধব করা যায় সেই অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অবিচল। আর তাঁর পরিকল্পিত উন্নয়নের কৌশলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ফিনিক্স পাখির মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছিল খাদ্যাভাব। ছিল অভাব। ছিল দারিদ্র্য। ছিল দুর্নীতি। কিন্তু তিনি পুরো সমাজের ও প্রশাসনের খোল নলচে বদলে দেবার আমূল সংস্কারবাদী সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। নয়া ব্যবস্থায় খাদ্যোৎপাদন বাড়ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম এবং পাশাপাশি তেল ও খাদ্যের দাম হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। তাই খাদ্যসহ জনগণের নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দাম হয়ে উঠেছিল আকাশছোঁয়া। মূল্যস্ফীতি ছিল বাড়ন্ত। ঘাটতির অর্থনীতিতে চোরাকারবারি, মজুতদার এবং দুর্নীতিবাজরা ছিল সক্রিয়। আর উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পাকিস্তানি নষ্ট কূটনীতিতে প্রভাবিত বিশ্ব মোড়লদের একাংশের খাদ্য সাহায্যকে ঘিরে চলছিল ভয়ংকর সব ভূরাজনৈতিক খেলা। তা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু ঘরে ও বাইরে সাহসের সঙ্গে তাঁর গণমুখী রাজনীতি, অর্থনীতি ও কূটনীতি সচল রেখেছিলেন। বিচক্ষণ মুদ্রানীতি, ডিমনিটাইজেশন, খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাক্রো অর্থনৈতিক স্থীতিশীলতা পুরোপুরি অর্জনের সুদৃঢ় ভিত্তি তিনি স্থাপন করে ফেলেছিলেন।

তবে দলের এবং দেশের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা মীরজাফরদের শিরোমণি ছিলেন খোন্দকার মোশতাক। নানা দিকের বন্ধু সেজে থাকা ঐ শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতার কোনো জুড়ি নেই। অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিকরাও বিপ্লবোত্তর একটি দেশের পুনর্নির্মাণে

সহযোগিতার বদলে সর্বক্ষণ বঙ্গবন্ধুর দেশ পরিচালনার সমালোচনা করে চলছিলেন। কোমলমতি অস্থির তরুণদের আরও অস্থির করে তুলছিলেন। আর আমলাতন্ত্র ও সামরিক বাহিনীর অন্দরমহলে তো চলছিল ষড়যন্ত্রের নানা কসরত। এসবে পাকিস্তানি ও প্রভাবশালী একটি পরাশক্তির গোয়েন্দাদের মদদ তো ছিলই। এমন সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেও বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী রূপান্তরবাদী নেতৃত্বের গুণে দেশের অর্থনীতি দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তিনি। কৃষকদের উন্নয়নের জন্য বীজ, সার ও ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলেন অল্প সময়ের মধ্যেই। কৃষকদের ছাড়াও নগরের বেশিরভাগ মানুষের জন্য রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাড়তি মনোযোগ দিয়েছিলেন সামাজিক সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহে। গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দাঁড় করাতে তিনি ছিলেন খুবই তৎপর। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ ছাড়াও গ্রামগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রাধিকার দেন। আর নিজ নিজ ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার দিয়ে তিনি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার না করার নীতি গ্রহণ করেন। সমাজের ভেতরে সাম্প্রদায়িকতার কারণে যাতে শান্তি বিনষ্ট না হয় সেজন্যেই তিনি এই উদারনৈতিক ও আধুনিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সম্প্রতি এলএসইতে এক ভার্চুয়াল আলোচনায় বলেছেন যে, শুধু এই নীতির কারণেই বিশ্ববন্ধু হওয়ার অধিকার রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি শিক্ষা কমিশন ইউজিসি স্থাপনসহ অনেকগুলো সংস্কারধর্মী উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিতে ২৪ শতাংশ বিনিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষা খাতে ৭.১ শতাংশ বরাদ্দ রেখেছিলেন। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনে মনোযোগী হয়েছিলেন। সব ধরনের অবকাঠামো পুনর্বাসনে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। সারা দুনিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে তিনি ছিলেন খুবই তৎপর। তিনি কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে ছিলেন সর্বদাই নিবেদিত। আর এ কারণেই তাঁর নান্দনিক নেতৃত্ব এতটা দরদি এবং হৃদয়গ্রাহী।

আমাদের বড়োই দুর্ভাগ্য যে ১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্টের কালরাত্রিতে এদেশেরই কিছু ক্ষমতালোভী কুসন্তান-পিশাচ বাঙালির মুক্তির এই মহানায়ককে নির্মমভাবে হত্যা করে। ওরা ভেবেছিল এই হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালি জাতির হৃদয় থেকে চিরদিনের জন্য তাঁকে মুছে ফেলা যাবে। কিন্তু এমন একজন অফুরান প্রাণশক্তির রাজনীতির অমর কবিকে কি আসলেই হত্যা করা যায়? মোটেও না। তাই তো তিনি চির-জাগ্রত আমাদের গল্পে, কবিতায়, শিল্পীর তুলির আঁচড়ে। আছেন তিনি বাংলাদেশের অসংখ্য নদীর স্রোতোধারায়, পাখির ডাকে, রবীন্দ্রনাথের গানে, নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় আর বিশাল সবুজ প্রান্তরে। শিশুদের কলকাকলিতে। দুঃখী মানুষের অন্তরজুড়ে। দিন দিন তিনি আরও বড়ো হচ্ছেন। বিরাট হচ্ছেন। ব্যাপক হচ্ছেন। কেননা তিনিই যে আমাদের ভবিতব্য। তাঁর নামেই যে মানবজাতি ও বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের দরজা নিমিষেই খুলে যায়। প্রকৃতিও যে আশা করে আমরা যেন নিরন্তর বঙ্গবন্ধুর কথা বলি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে যেন বঙ্গবন্ধুকে উপলক্ষ করেই লিখেছেন, 'স্বদেশকে একটি ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহারে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশী সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেই একতাই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে সবচেয়ে বড়ো পুঁজি হিসেবে কাজ করেছে। সেই ঐক্য আজও খুবই জরুরি। মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়নি। এখন চলছে তাঁর নির্দেশিত অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম।

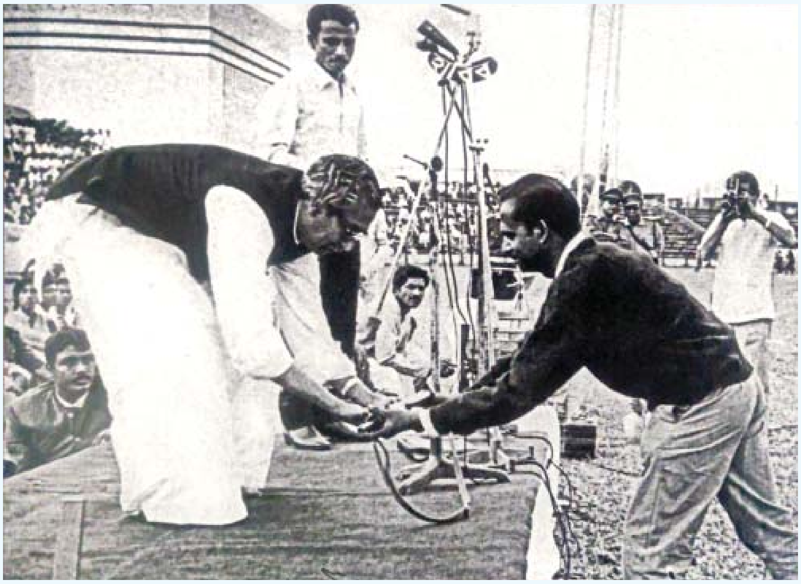

ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে অস্ত্র জমা দিচ্ছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা, ৩১শে জানুয়ারি ১৯৭২

তাই অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে তাঁর সামাজিক সুবিচার ও মানবিকতা নির্ভর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথেই হাঁটার। বর্তমান সময়ে অনেক ধরনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এসেছে। করোনাঘাতের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করতে না করতেই আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফল ভোগ করতে হচ্ছে সারা বিশ্বকে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। এই যুদ্ধ প্রায় সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নড়বড়ে করে ফেলেছে। তবু এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে। পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের মধ্যে দিয়ে এক নতুন অর্থনৈতিক অবগাহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট চলছে তা থেকে উত্তরণের জন্যও বঙ্গবন্ধুর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অসামান্য নেতৃত্ব থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। 'সোনার বাংলা' অভিমুখে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জয়যাত্রার সূচনা হয়েছে তাতে যেন আমরা যুক্ত থাকি এবং অবিচল থাকি। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা।

প্রফেসর ড. আতিউর রহমান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

‘শোক’ এখন ‘শক্তি’র অনির্বাণ উৎস

মোনায়েম সরকার

বঙ্গমৃত্তিকায় যেসব মহান পুরুষ জন্ম নিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের জাতির পিতা। তাঁর দূরদর্শী ও ক্যারিশমেটিক নেতৃত্বে একটি পরাধীন জাতি পায় স্বাধীনতার স্বাদ। বহু বছরের শোষণ-দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি গড়ে তোলেন সমৃদ্ধিশালী, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। একটি অবহেলিত ভূখণ্ডের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন করার মতো নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই বিরল নেতা। শেখ মুজিব প্রজাপ্রেমী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। যে মানুষটি কখনোই বাঙালিকে অবিশ্বাস করেননি, শত্রু ভাবেননি, সেই শুদ্ধচিত্তের মানুষটিকেই সপরিবার হত্যা করল কতিপয় স্বার্থপর ঘাতক বাঙালি– যা শুধু বাঙালির ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও একটি কলঙ্কজনক ঘটনা বলে বিবেচিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড শুধু একটি হত্যাকাণ্ডই নয়, একটি স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক জাতিকে পরাধীন ও সাম্প্রদায়িক করার পাশবিক চক্রান্তও বটে। আমরা যদি মুজিব হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রগুলো বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব– একটি স্বাধীন জাতিকে মূলত তারাই ধ্বংস করতে চায় যারা সাম্রাজ্যবাদের পূজারি বা সাম্রাজ্যবাদের মদদদাতা। সুতরাং যারা সাম্রাজ্যবাদী এবং যারা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক তারাই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারী থেকে হত্যাকাণ্ড বাস্তবায়নকারী সকলেই অপরাধী, সকলেই মুজিব-হন্তারক।

শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র বাংলাদেশ থমকে গিয়েছিল। বজ্রাহত মানুষের মতো অসাড় হয়ে গিয়েছিল বাংলার শোকাহত মানুষ। ঘনিষ্ঠ স্বজন মারা গেলে মানুষ যেমন বাকরুদ্ধ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়, শেখ মুজিব হত্যার ঘটনায়ও পুরো বাঙালি জাতি শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গিয়েছিল। মানুষ এখন সেই অবশ মুহূর্তগুলোর কথা ভুলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করছেন, তাঁর নামে স্তুতি-স্তব করছেন, এটাই এখন ইতিহাস।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। এদিন কেবল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি, মুজিবপত্নী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র-পুত্রবধূসহ গোটা পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কোনো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিব নিহত হননি। আবার কেবল ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধি বা ব্যক্তিগত আক্রোশ নয়, এর সঙ্গে জড়িত ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা। এই চক্র এখনও সক্রিয় রয়েছে। তা আমরা প্রতিনিয়তই বুঝতে পারছি। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণার আগের দিন ঢাকা শহরে বাস-ট্রাকে আগুন, ব্যাপক ভাঙচুর ও নাশকতামূলক তৎপরতায় মানুষের মনে সে কথাই ধ্বনিত হয়েছে। বিএনপি যে আবরণেই তার তৎপরতা চালাক না কেন, জনগণ ঠিকই তাদের নাশকতামূলক তৎপরতা ধরে ফেলেছে। এ কাজ করে তারা তাদের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নিয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে নির্মম ও নৃশংস। দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা সদম্ভে ঘোষণা করেছে এ খুনের দায়দায়িত্বের কথা। তবুও এই ঐতিহাসিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল দীর্ঘ একুশ বছর। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হলে অনেকের মুখোশ খুলে যেত, তাই তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে দেশের প্রচলিত আইনকে। আইন তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পেরেছিল কি না– দেশবাসী আজ ঘাতকচক্র ও তাদের মদদদাতাদের কাছে জবাব চায়। জনগণ এও জানতে চায়, এই হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো কেন?

১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ‘দি ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫’ জারি হয়। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এই কালো অধ্যাদেশ বাতিল করলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় নিহত জাতীয় চারনেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানসহ সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার বাধা অপসারিত হয়। পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক দুঃশাসনের কালে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। যে মহান ব্যক্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছেন, বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় আদায় করে দিয়েছেন, বাঙালি জাতির একটি নিজস্ব আবাসভূমি এনে দিয়েছেন, সেই ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের বিচার এত দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল, এ কথা কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ ভাবতেই পারে না।

বঙ্গবন্ধুর বড়ো কৃতিত্ব তিনি বাঙালি জাতিসত্তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে এর প্রক্রিয়াকরণ চলেছে বহুদিন ধরে। বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান, আন্দোলন ও সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ যা এক সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল, সেই সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই শেখ মুজিব ‘পূর্ববঙ্গ’কে ‘বাংলাদেশ’ বলে ঘোষণা করেছিলেন। বাংলার রাজনীতিতে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধারার সূচনা করেন। এদেশের রাজনীতির মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক ধারাটিকে ভেঙে দেন তিনি। ‘মুসলিম লীগ’ থেকে ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ এবং ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দিয়ে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষকে নিয়ে গঠন করেন ‘আওয়ামী লীগ’। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন শেখ মুজিব। ১৯৭০-এর দশকে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এমনভাবে সমার্থক হয়ে উঠেছিল যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না এবং এ সময় মানুষের মাঝে বাঙালি চেতনাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব স্ফুরণ ঘটেছিল।

বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ

বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত আহ্বান। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। একাত্তরের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেপ্তার হন। পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে বাংলাদেশ গঠনের পথ সুগম করার অপরাধে পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। কিন্তু বিশ্বজনমতের চাপে তারা তা কার্যকর করতে পারেনি। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তানের যেসব দেশি-বিদেশি দোসর মেনে নিতে পারেনি তারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর দোসর এবং জামায়াতের আলবদর বাহিনীর সমর্থকরা নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। নানা বাধা, ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থিতিশীলতার দিকে নেন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য ছিল। সোনা-রুপা, টাকাপয়সা, অবকাঠামো কিছুই সেদিন ছিল না। বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শ্মশান বাংলাকে স্বনির্ভর বাংলাদেশে পরিণত করেন। ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছিলেন, সদিচ্ছা থাকলে শূন্য হাতে যুদ্ধ করেও সফল হওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু যখন সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করতে সফল হয় ষড়যন্ত্রকারীরা। তস্করের মতো রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হয় কতিপয় বাঙালি ঘাতক। এসব ঘাতকেরা বিদেশি প্রভুদের ইঙ্গিতে এবং এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক নরপশুদের সহযোগিতায় ইতিহাসের কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধারা ফিরিয়ে আনা হয়। হত্যাকারীরা বাংলাদেশের সর্বত্র ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠিত করে এবং দেশপ্রেমিক নেতাকর্মীদের ওপর জেল-জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হতচকিত জাতি এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে অবস্থান নিতে পারেনি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল নেতৃত্বের কারণে। দলের লড়াকু নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় দলীয় কাজকর্ম যেন কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তাই তারা কর্মীদের নিয়ে প্রতিবাদে মুখর হতে পারেননি।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং তাঁর হত্যাকাণ্ড যেমন ২০০ বছর পিছিয়ে দিয়েছিল আমাদের, তেমনি ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডে আমরা পিছিয়ে যাই এবং দেশ আবার উলটোমুখে ফিরে যায় পাকিস্তানি ধারায়। এতে পাকিস্তানিরা এবং দেশীয় ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা উল্লসিত হয়। মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মকে টেনে আনা হয় রাজনীতিতে এবং বাংলাদেশ সংস্কৃতি ও জীবনমান উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে যায়। জেল-জুলুম-অত্যাচারের ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায় অনেক নেতাকর্মী। যে বঙ্গবন্ধু নামের বীজমন্ত্রে বাংলাদেশ উদ্বেলিত ছিল, সেই নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যিশু খ্রিষ্টের হত্যাকাণ্ডের একটি অদ্ভুত মিল আছে। মানুষের মুক্তির কথা বলতে গিয়ে ঘনিষ্ঠ সহচরদের ষড়যন্ত্রে ক্রুশবিদ্ধ হন যিশু। যিশুর মৃত্যুর পরে দীর্ঘদিন তাঁর নাম উচ্চারণ করা যায়নি, অথচ আজ সমগ্র বিশ্বে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সর্বাধিক। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডেও গোপনে হাত মিলায় তাঁর কতিপয় সহযোদ্ধা। তারাও দীর্ঘকাল বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চার বছর পরে ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে ১৫ই আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে শোক পালন করা হয়। ১৯৭৯ সালে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করে আমরা শোকসভা করি। প্রকাশ করি– *বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*, *রক্তমাখা বুকজুড়ে স্বদেশের ছবি* ও *বাঙালির কণ্ঠ*-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থ। যিশুর মানবমুক্তির বাণী ও আদর্শকে যেভাবে আলিঙ্গন করেছে বিশ্ববাসী, তেমনি বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত রাজনৈতিক মতবাদ 'শোষিতের গণতন্ত্র'ও একদিন মানবিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীজুড়ে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেমে আসে মহাবিপর্যয়। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে টানা একুশ বছর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। অসংখ্য সংগ্রামী জনতার রক্ত ঝরে বাংলার মাটিতে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর স্বাধীনতার ধারায় বাংলাদেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের হত্যা এবং আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মীদের ওপর নির্মম দমননীতির মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা হয়। শেখ হাসিনার দূরদর্শী, সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দ্রুত পুনর্গঠিত হয়। জনগণ ফিরে পায় ভোটাধিকার। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন এই অধিকার প্রয়োগ করে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আওয়ামী লীগকে। পাকিস্তানি ধারার পরিবর্তে দেশ পুনরায় এগিয়ে চলে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ধারায়। অর্থনীতি ফিরে পায় গতিশীলতা। তলাবিহীন ঝুড়ি আর ভিখারির দেশের অপবাদ ঘুচিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল।

বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। শত্রু-মিত্র চিনতে হবে তাঁকে। কেউ যেন বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে সুবিধা আদায় না করতে পারে– এ দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি সম্মানার্থে কর্মীদের উচিত তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো নিপুণভাবে সম্পন্ন করা। দেশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের কাঁধে পড়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এখনও অনেক চড়াই-উতরাই পার হতে হবে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন সহজ ব্যাপার নয়, অনেক কঠিন। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করে যেতে হবে। এদেশকে একবিংশ শতাব্দীর যোগ্য করে গড়ে তুলে ধরতে হবে।

বঙ্গবন্ধু আজ বিশ্ববন্ধু হয়ে উঠেছেন। তাঁর নামে ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন তিনি। শান্তিকামী বঙ্গবন্ধু শান্তির পক্ষে লড়াই করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নামে ইউনেসকো ঘোষিত শান্তি পদক বাঙালি জাতিকে নতুন গৌরব দান করেছে। সারা বিশ্বেই এখন মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। করোনা মহামারির কারণে আনুষ্ঠানিকতায় কিছুটা ধীর গতি এলেও মানুষের অন্তরে বঙ্গবন্ধু আজ অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ১৫ই আগস্ট বাঙালির জন্য এখন শুধু আর শোকের মুহূর্ত নয়, শোক এখন পরিণত হয়েছে শক্তির অনির্বাণ উৎসবিন্দুতে। নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। জাতীয় শোক দিবসে পঁচাত্তর ট্র্যাজেডির শহিদদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

মোনায়েম সরকার: রাজনীতিবিদ, লেখক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, গীতিকার ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ

বঙ্গবন্ধুকে নয়, সেদিন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকেই হত্যা করা হয়

জাফর ওয়াজেদ

স্বাধীনতার পূর্বাপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রমাণিত হয় যে, রাজনীতিকরা হত্যাকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিল। দেশ যখন ছিল ব্রিটিশ কিংবা পাকিস্তানি উপনিবেশ, তখন দেশের মানুষ সবাই ছিল স্বদেশ অন্তঃপ্রাণ। যেন দেশমাতৃকার যোগ্য সন্তান হতে পারে, এই কামনা, প্রার্থনা, বাসনা ছিল। আর ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি উপনিবেশের শিকার বঙ্গদেশ হয়ে পড়ে হতশ্রী, দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ এক অঞ্চল। যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া দেশকে আপন করে তোলার কাজটি তো আর সহজ ছিল না। বরং স্বাধীন স্বদেশ পেয়ে দেশটাকে নিকুচি করার কাজে লোকের কমতি ছিল না।

স্বাধীন হওয়ার আগে বলা হতো, দীন-দুঃখিনী মা যে মোদের, এর বেশি তার সাধ্য নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর আর তর সয়নি। সমস্বরে যেন বলা হয়, তোমার সাধ্যে কুলোক আর না কুলোক, তোমার ভাঁড়ারে কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমাদের দাবি আগেভাগে মিটিয়ে দিতে হবে। 'জয় বাংলা' ধ্বনির মর্যাদা ভুলে গিয়ে দেখা গেছে, 'লুটেপুটে খাই খাই' স্বভাবটা সামনে এসে হাজির হয়েছে কারও কারও। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটা যে গড়ে তুলতে হবে এবং এই তোলার মধ্যেই যে রয়েছে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য, লাখ লাখ মানুষের আত্মদানের মহিমা প্রতিষ্ঠা এবং মা-বোনদের সম্ভ্রমহানির গ্লানি মুছে ফেলা। কিন্তু নিজ দেশটাকে 'ভাগাড়' বানাতে কম কসুর করেনি একদল উঠতি সশস্ত্রজন।

অস্ত্রের ঝনৎকার তখন চারদিকে। সেই অস্ত্র নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ি লুট, অস্ত্র লুট, শ্রেণিশত্রু খতমের নামে সাধারণ মানুষ হত্যা শুধু নয়, জনপ্রতিনিধিদের প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটেছে। মোদ্দা কথা, পরাধীনতাকে, উপনিবেশকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, স্বাধীনতাকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরাধীনতা যেমন অসহনীয়, অবাঞ্ছনীয়, স্বাধীনতা যে আবার তেমনই মহামূল্যধন, সে কথাটি মনেপ্রাণে অনুভব করেনি। খুব হালকাভাবে নিয়েছে। ভেবেছে দুঃখের দিন গেল, সুখের দিন এল। অনেক কষ্ট করেছে, এখন আরাম করবে। অনেক ত্যাগ করেছে, এখন ভোগ করবে। এতদিন দাসত্ব করেছে, এখন প্রভুত্ব করবে। আর এখানেই হয়েছে মারাত্মক ভুল। পরাধীনতার পাপ বিদায় করতে যতখানি ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে, স্বাধীনতার পুণ্যফল ভোগ করতেও আবার তেমনি কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন রয়েছে, তা বেমালুম ভুলে গেছে। যেমন ভুলেছে দেশের কাজে আনন্দ আছে, আরাম নেই। দেশপ্রেম রজকিনী প্রেমের মতো নিকষিত হেম, স্বার্থ গন্ধ নাহিক তায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে প্রাপ্য চাই বলে যারা হুলুস্থুল করেছিলেন, তারা বুঝতেই পারেননি দেশপ্রেম শুধু যুদ্ধজয় নয়, যুদ্ধশেষের ধ্বংসস্তূপে নতুন জীবন গড়ে তোলাও। দেশ সেবার কোনো দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করতে পারেনি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি যে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি, বরং বীরদর্পে শক্তি সঞ্চয় করে আবার সশস্ত্র হয়ে ফিরে আসবে, নেবে পরাজয়ের প্রতিশোধ, সে বোধ কারও মনে ঠাঁই পেয়েছে তা নয়। বরং একাত্তরে গণহত্যাকারী পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগী বাঙালি চরদের বিচার কাজেও বাধা আসে গোড়াতে। দালাল আইন বাতিল করার জন্য বর্ষীয়ান নেতাও মাঠ গরম করে তুলেছিলেন শুধু নয়, অনশন কর্মসূচিও পালন করেছেন। স্বাধীনতাকে মেনে নিতে না পারা চরমপন্থিরা সর্বত্র সশস্ত্র মহড়া দিয়ে লুটপাট, হত্যাযজ্ঞ বহাল রেখেছে। কিন্তু যুদ্ধজয়ী কারও মনে এমন বোধোদয় হয়েছে যে, পরাজিত শত্রুর কোনো চিহ্ন রাখতে নেই, তা নয়। বরং শত্রুদের আশ্রয় দিয়েছে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়। ওরা আবার সংগঠিত হতে থাকে নানারূপে, নানা কায়দায়। পাশাপাশি যাদের দৌলতে স্বাধীনতা লাভ, তাদের যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাদের পুনর্বাসন বা দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করা হয়নি। গ্রামের যে যুবকটি কোনো দিন সাধারণ রাইফেল বা বন্দুক দেখেনি, তার হাতে যখন স্টেনগান, এসএমজি, এলএমজি উঠে আসে, তখন তার জীবন চেতনা বদলে যেতে বাধ্য। একাত্তর তার মধ্যে দেশপ্রেমের যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল, যুদ্ধোত্তর দেশে সে আগুন নিভিয়ে দিয়ে তাকে বনসাইয়ে পরিণত করার প্রচেষ্টা হিতে বিপরীত হয়েছে। ফলে স্বাধীনতাকে যতখানি মর্যাদা দেওয়ার কথা, তা-ও দেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর দেশময় বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, খুনখারাবি, চোরাকারবারি, মজুতদারি সবকিছু চলেছে অবাধে। তাই বঙ্গবন্ধুকে মজুতদার ও চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে বলতে হয়েছে, এদের নির্মূল করতে হবে। দুর্বৃত্তরা ততদিনে আশ্রয় নিয়েছে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলে।

তারা জানত, তাদের এসব অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দেবে দলীয় নেতারা, যদি অন্যায়কারীও দলের লোক হয়। যে-কোনো কাজেরই সমর্থন পেয়েছে রাজনৈতিক দলের কাছে। এমনকি এরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ও যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলের কাছেও আশ্রিত হয়েছে। দেশের স্বার্থ ততদিনে গৌণ হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ সামনে চলে আসায় সমাজের শৃঙ্খল ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। যুদ্ধে ভঙ্গুর রাষ্ট্রযন্ত্রকে গড়ে তোলার কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। বরং যে-কোনো অপকর্মের অপরাধ থেকে মুরুব্বির জোরে রেহাই পেয়েছে। এরই ফলে সমাজের সব বাঁধন শিথিল হতে থাকে। সমাজ বলতে দেশের জীবন। সেই জীবনের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের প্রকাশ। সেই চরিত্রটির অবস্থা এমন ক্ষণভঙ্গুর হতে থাকে যে, গোটা দেশটিকে আইনের শাসনের আওতায় আনার পথে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে থাকে। প্রশাসন পরিচালনার জন্য দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ ও সাহসী মানুষের অভাব ছিল তীব্র। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ও না নেওয়াদের মধ্যে এক ধরনের স্নায়বিক সংঘাত দেখা দেয়। স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি বহুধাবিভক্ত হতে থাকে। আর পরাজিতরা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে নিজস্ব বিবেককে মুছে ফেলে। জাতীয় চরিত্রটির মধ্যে ভাঙন ধরেছে বলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে সহস্র প্রতিকূলতার ভেতর গড়ে তোলার কাজটি এককভাবে করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই। নানা চিন্তা-চেতনায়, নানা মতবাদে আপ্লুতদেরও তিনি কাছে টানতে চেয়েছেন। পাকিস্তানি যুগের বিভেদকে ভুলে বাঙালির নিজস্ব রাষ্ট্রটি গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি ছিল উদাত্ত আহ্বান। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে দেশে-বিদেশে নানা ফ্রন্টকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। দেশে দলের একটা প্রাগ্রসর অংশ বেরিয়ে সশস্ত্র পন্থায় ধাবিত হয়। তারা খাদ্য ও পাটগুদাম, কারখানায় অগ্নিসংযোগ, থানা, ফাঁড়িতে হামলা, অস্ত্র লুট, হত্যাযজ্ঞ চালায় বিপ্লবের নামে। মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী চীনের অনুসারী চরমপন্থিরা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শ্রেণিশত্রু খতমের নামে সাধারণ কৃষক থেকে সংসদ সদস্য পর্যন্ত হত্যা করে। গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করা ছাড়াও পুলিশ ও থানা আক্রমণ, লুটপাট চালাতো। সারা দেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে আতঙ্ক ছড়ায়। এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার মতো আইনশৃঙ্খলা

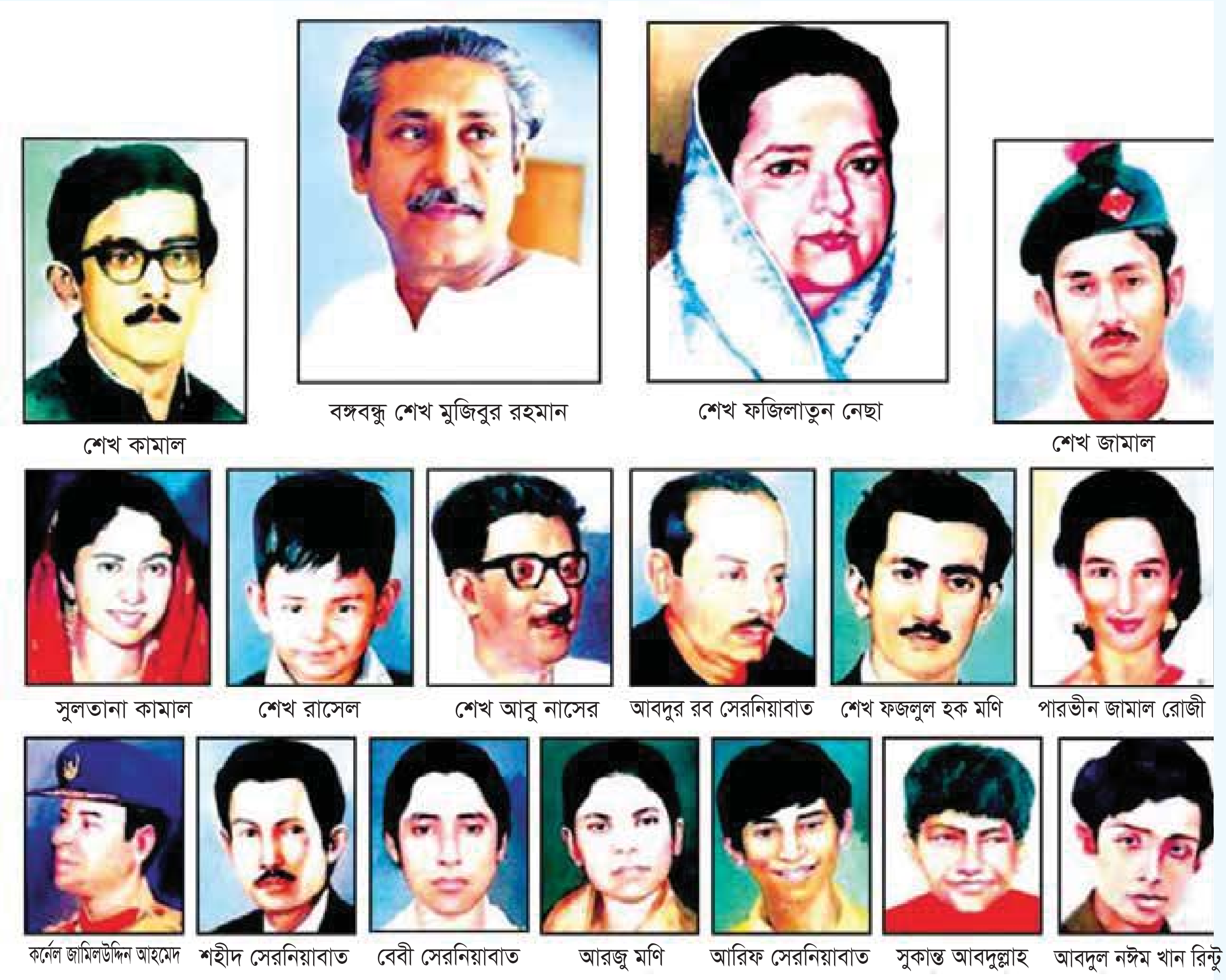

শেখ কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ ফজিলাতুন নেছা, শেখ জামাল

সুলতানা কামাল, শেখ রাসেল, শেখ আবু নাসের, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণি, পারভীন জামাল রোজী

কর্নেল জামিলউদ্দিন আহমেদ, শহীদ সেরনিয়াবাত, বেবী সেরনিয়াবাত, আরজু মণি, আরিফ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত আবদুল্লাহ, আবদুল নঈম খান রিন্টু

বাহিনীকে যখন গড়ে তোলা হচ্ছে, তাদের ওপর আক্রমণটা এমনই তীব্র হয় যে, দুর্গম অঞ্চলগুলো সশস্ত্র চরমপন্থিদের অভয়ারণ্য হয়ে ওঠে। বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত যানবাহন ঘাটতি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকা, ইত্যাকার নানা সমস্যাক্রান্ত তখন পুলিশ বাহিনী। যে বাহিনীর ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরেই হামলা চালিয়েছিল, সেই পথ ধরে গণবাহিনী, সর্বহারাসহ চরমপন্থিরাও স্বাধীনতার পরপরই পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত শুধু নয়, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। দেশকে স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রটি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল। পরাজিত পাকিস্তানের থাবা তখনও বিদ্যমান। চীনপন্থিরা হয়ে ওঠে পাকিস্তানিদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র পূরণ এবং বাস্তবায়নের বাহন। বঙ্গবন্ধুকে এসব মোকাবিলা করতে হয়েছে ভঙ্গুর প্রশাসন দিয়ে। সেদিন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে আসেনি। বরং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিরোধিতায় আদাজল খেয়ে লেগেছিল। অপপ্রচারের মাত্রা ছিল তীব্র। এই গোষ্ঠীটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করে পাকিস্তানি হানাদার শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ শুধু নয়, তাদের নির্দেশ মেনে চলেছিল। শেখ মুজিবের নামে এবং নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক– এমনটা চায়নি যারা, তারা স্বাধীনতার পরও বিরোধিতা করেছে। অনেকে অদ্যাবধি নিহত বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদ্‌গার চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে বিশুদ্ধ বাঙালিরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। স্বার্থের সংঘাত ছিল না। স্বার্থ ছিল দেশকে স্বাধীন করা, হানাদারমুক্ত করা এবং বাঙালির শাসন প্রতিষ্ঠিত করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা। কিন্তু যেই না স্বাধীন হলো, অমনি স্ব স্ব সম্পর্কের স্বার্থ এমন মাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল যে, পরাজিত শক্তিরা হালে পানি পেল। অর্থ, অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে তারা নানাভাবে নানারূপে এগিয়ে আসতে থাকে। তাদের তৎপরতা গড়াতে গড়াতে বঙ্গবন্ধুর দলের ভেতরও অবস্থান নিতে থাকে। শেখ মুজিব দেশ গড়ার কাজে ডাক দিয়েছিলেন। অনেক আকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছিলেন। দেশটি গড়ার জন্য তিন বছর সময় চেয়েছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন প্রবল প্রতিকূলতায়। দেশকে একটি জায়গায় এনে স্থিতিশীল করে তোলার প্রক্রিয়ায় অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন জাতির পিতা, তাই সব মানুষের প্রতি ছিল মমত্ববোধ। বিশেষত সাধারণ মানুষের প্রতি। যাদের জন্য তিনি নিজের জীবন, যৌবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন। বিভেদ, পরশ্রীকাতরতা ভুলে সোনার বাংলা গঠন করার লক্ষ্যে যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন, তার বিকাশমান পর্যায়ে নিষ্ঠুর আঘাতটি হানা হয়েছিল। যে সংহতি বঙ্গবন্ধু সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাকে সংহার করা হলো। দেশ ফিরে গেল একাত্তর-পূর্ব পর্বে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ এবং পরে সমর্থিত দল বাকশাল নেতাকর্মীরা এ ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। যখন

বঙ্গভবনে শপথ নিচ্ছে বঙ্গবন্ধুরই মন্ত্রিসভার সদস্যদের একটা বড়ো অংশ, তখন আরেক অংশকে ক্রমশ কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থান হলে বাকশালের মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার কথা নয়, আইয়ুব স্টাইলে উর্দিওলারাই ক্ষমতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতেন।

সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য রাজনীতিকদের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসীন করে তাদের মতাবলম্বীদের। সংবিধান ও সংসদ তখনও বহাল। রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে পদটিতে দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি সংবিধানেই নির্ধারিত। সংসদ সদস্যরা ক্ষমতা দখলকারী খোন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ দখল করার বিরোধিতায় একাট্টা হয়নি। স্পিকার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সংসদ ডেকে পদক্ষেপ নিতে পারতেন কি না, সে প্রশ্ন আজও অবান্তর নয়।

সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা পালন করেছে, তা নয়। কেন পারেনি, কেন দায়িত্বে অবহেলা করেছে, সেসব আজও অনুদঘাটিত। সেসময় ঢাকায় দলের প্রায় সব সংসদ সদস্য, প্রশিক্ষণরত বাকশালের জেলা গভর্নর, দলের কেন্দ্রীয় নেতারা অবস্থান করছিলেন। ছাত্রনেতারা ব্যস্ত ছিলেন ১৫ই আগস্ট সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে আয়োজনে। সেদিন হরতাল ডাকা হয়েছিল সশস্ত্র একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। শহরে বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে। এক ধরনের আতঙ্ক ১৪ই আগস্ট দিনে-রাতে তৈরি করা হয়। নগরবাসীর ওপর মানসিক চাপ আগেই তৈরি করা হয়। সমাবর্তনে যোগদানকে সামনে রেখে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও সে রাতের ঘটনা প্রমাণ করে না নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামান্যতম হলেও ছিল। হত্যাকাণ্ড ঘটানোর আগের সময়গুলোতে কারা কারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন, কারা বঙ্গবন্ধুর তথ্য পাচার করত, সেসব অজানাই থেকে গেছে। দলের ভেতর নানা উপদল, গ্রুপ, উপগ্রুপগুলোর তৎপরতা-অপতৎপরতার ভেতর বঙ্গবন্ধু বিদ্বেষ মাত্রা কতটা ছিল, তা অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রয়োজন ছিল, সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই হত্যার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রকারীদের অবস্থান রয়ে গেছে অজ্ঞাত। তারও নেপথ্য-প্রকাশ্য কারণ রয়েছে।

সেদিন যার যা দায়িত্ব ছিল, তারা তা যথাযথভাবে বা সামান্যতম হলেও পালন করেছিলেন, এমনটা জানা যায় না। বরং ঘাতকরা যে বেতার-টিভিতে বঙ্গবন্ধুকে 'খুনি, ডিকটেটর, সম্পদলুটেরা' ইত্যাকার বানোয়াট অভিধা দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল, তাতে ভয়ার্ত, আতঙ্কিত হওয়ার কী কারণ ছিল বাকশাল নেতা, সংসদ সদস্যদের। প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যর্থতার কথা আংশিক হলেও সর্বজনবিদিত। কিন্তু রাজনীতিকদের ভূমিকা ও অবস্থান দেখে বিস্মিত হতে হয়েছে সেদিন। বঙ্গবন্ধু নেই জেনে শোকাহত সাধারণ মানুষকে সেদিন শক্তিতে পরিণত করে দেশকে পাকিস্তানপন্থিদের হাতে চলে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেননি। সরকারি দলের নেতাদের অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল এই ধারণা জন্মেছিল যে, বঙ্গবন্ধু নেই, তাতে কী হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতারাই তো ক্ষমতায়। অনেকে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অথচ মুজিববিরোধিতা দিয়েই মোশতাক এবং তার সেনা-সহযোগী জিয়ার অবস্থান গ্রহণ। মোশতাক ক্ষমতায় বসে বঙ্গবন্ধু প্রণীত সব ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করে পাকিস্তানি বিধিবিধান চালু করে। পাশাপাশি জাতীয় চার নেতাসহ অন্যান্য নেতা, যাঁরা তার আনুগত্য মেনে নেননি, তাঁদের কারাগারে পাঠায়। মোশতাক যখন বুঝতে পারে, আওয়ামী লীগ নেতানির্ভর দল নয়, কর্মীনির্ভর দল, তখন সারা দেশে কর্মীদের তার পক্ষে টানার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর জেলা ও থানা পর্যায়ে তার বিরোধী নেতাদের মামলা-হামলার ভয় দেখিয়ে কাউকে কাউকে অনুগত করে। অনেককে জেলে পাঠায়। অস্ত্র উদ্ধারের নামে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘরে তল্লাশি চালানো হয়। প্রশাসনে পাকিস্তানপন্থি আমলাদের বসানো হয়।

মোশতাক খুব স্বল্প সময়ে এবং দ্রুত তার কার্য সমাধা করে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পেরেছিল ৮৩ দিনের ক্ষমতা দখলকালে। মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, হাজী দানেশ, মওলানা তর্কবাগীশ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সংগঠন তার প্রতি সমর্থন জানায়। অনেক সংসদ সদস্য সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিষোদ্গার করে মোশতাকের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিল। মোশতাক পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন আদায়, কট্টর বামপন্থি ও স্বাধীনতাবিরোধী দালালদের উন্মুক্ত পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

পাকিস্তানিদের পক্ষে দালালির অভিযোগে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় কাজে ধর্মের প্রাধান্য দান, কালো টাকা বৈধকরণসহ অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু, বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্তির কাজটি দ্রুত সেরেছিলেন। দেশজুড়ে তার এবং খুনি সেনাকর্মকর্তা ফারুক-রশিদ-ডালিমের প্রহরায় পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়নি। তার প্রতি বিরূপ আওয়ামী লীগারদের বিচার করার জন্য মোশতাক দুটি সামরিক আদালত গঠন করে। অস্ত্র উদ্ধারের নামে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করায়।

৬১টি জেলা গঠনের আদেশ বাতিল করে ১৯টি জেলা বহাল করে। একপর্যায়ে সব রাজনৈতিক দল ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে। কিন্তু মোশতাক ও তার অনুসারীরা নিজস্ব রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ভাসানী ন্যাপ পুনর্গঠিত হয়। দালাল আইনে আটক তাদের নেতা যাদুমিয়া ছাড়া পেয়ে পাকিস্তানি ধারা চালু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের সমন্বয়ে ক্ষমতা দখলকারীদের কেউই তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়েছেন, তাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শোনা যায়নি। দলের নেতাকর্মীদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস বাড়ছিল। কাউকেই আর বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না।

দেশের মানুষ এমন একটা ধাক্কা খেয়েছে ১৫ই আগস্ট, তারা নির্বিকার, ভাবালুতাহীন হয়ে পড়েছিল। শোকের, বেদনার মাত্রা খুব তীব্র ছিল বলেই ঘুরে দাঁড়ানোর ইচ্ছে থাকলেও দাঁড়াতে পারেনি। সেদিন কেউ জনগণকে খুনিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে ডাক দেয়নি। যাদের দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করা, তারাই খুনিদের প্রতি, মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্যে শুধু ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশ নামক তাঁর সৃষ্ট রাষ্ট্রটাকেও হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বাপর। ১৯৭৫ সালে ঘাতকরা সফল হয়েছে। শেখ হাসিনাকেও ২১ বার হত্যার চেষ্টা হয়েছে। এখনও ষড়যন্ত্র চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পেছনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন তাঁর সৃষ্ট দেশটাকে স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে, যাতে দেশ ও দেশবাসী ফিরে পায় সেই স্বদেশ।

জাফর ওয়াজেদ: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

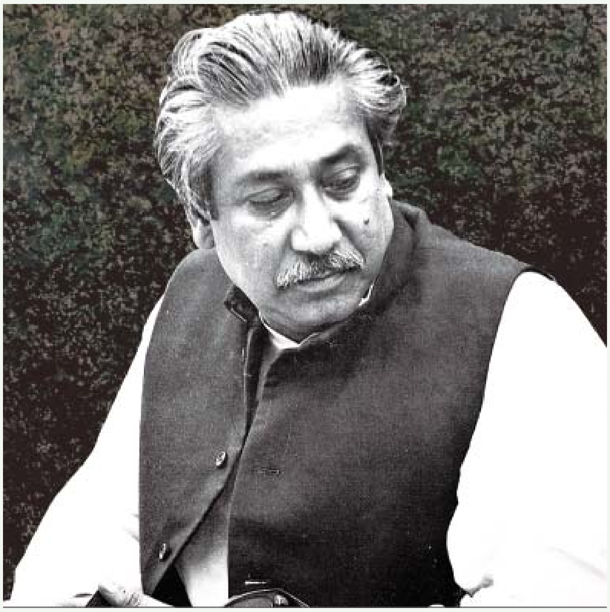

জাতীয় শোক দিবসে একটি ক্ষুদ্র বীক্ষণ

প্রফেসর ড. মো. নাজমুল হক

কফিনে পুরল ওরা, ঘাতকেরা, তাঁকে
অবহেলা আর অশ্রদ্ধায় ...
ঘাতকরা সে কফিনটিকে
নিষিদ্ধ দ্রব্যের মতো পাচার করতে চেয়েছিল
বিস্মৃতির বিয়াবানে আর সে কফিন
অলৌকিক প্রক্রিয়ায় একটি বিশাল
সন্তরণশীল নৌকা হয়ে ভাসমান সবখানে।
– শামসুর রাহমান

পৃথিবীর ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার বর্বর ঘটনাটি কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয় না। ঘৃণ্যতম এই হত্যাকাণ্ডটি কোনো গুপ্ত আততায়ী গোপনে সংঘটিত করেনি। ঘাতকেরা রাষ্ট্রপরিচালিত বেতার ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে সদম্ভে এ হত্যার দায় স্বীকার করে। তাদের সমস্ত অপতৎপরতা ছিল প্রকাশ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই হত্যাযজ্ঞের বিচার করা তো দূরের কথা, দখলদার রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক মাত্র এক মাস এগারো দিন পর ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ 'ইমডেমনিটি অধ্যাদেশ ১৯৭৫' জারি করে ১৫ই আগস্ট সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ঘাতকদের দায়মুক্তি প্রদান করে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়ে আপিল বিভাগ মন্তব্য করে যে, সেইদিন সংঘটিত ঘটনাসমূহ প্রমাণ করে অপরাধীরা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে, সেনা বিদ্রোহ সংঘটিত করার জন্য নয় (বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা ২০২১)।

একজন জাতির পিতা, স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশের রাষ্ট্রপতি, তাঁর নিজস্ব বাসভবন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটি আক্রান্ত হওয়ার পর প্রায় দুই ঘণ্টার মতো সময় পেয়েছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীপ্রধানসহ তাঁর বাসভবনেরই অতি কাছে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সাহায্য চেয়েছিলেন কিন্তু একমাত্র বীর দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তা কর্নেল জামিল ব্যতীত কেউ ছুটে আসেননি জাতির পিতা ও দেশের রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, কেবল বাহিনীপ্রধানগণ তাদের দেহরক্ষীদের নিয়েও যদি ৩২ নম্বরে এসে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন তাহলে ঘাতকের ক্ষুদ্র দলটি পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে পেত না। অথচ সেই কর্মকর্তারাই সকাল আটটার মধ্যে সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে দামি গাড়িতে আসীন হয়ে নতুন খুনি প্রেসিডেন্টের নিকট তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে এলেন।

এ দিন ভোরবেলা দেশের মানুষের ঘুম ভাঙে একটি কর্কশ কণ্ঠের ঘোষণায়। হতবিহ্বল মানুষ শুনতে পায় : 'আমি মেজর ডালিম বলছি। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। জননেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।' মেজর শাহরিয়ারের নেতৃত্বে একদল সৈনিক ভোর সাড়ে চারটার দিকে ঢাকা বেতারকেন্দ্র দখল করে নেয়। মেজর ডালিম সসৈন্যে উপস্থিত হয় সাড়ে পাঁচটার দিকে। সকাল সাড়ে সাতটায় কর্নেল রশিদ ও মেজর ফারুকের পাহারায় তথ্যমন্ত্রী তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হন বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সহচর বিশ্বাসঘাতক প্রেসিডেন্ট মোশতাক স্বয়ং। সকাল আটটার পর পরই ঢাকা বেতারকেন্দ্রে উপস্থিত হন তিন বাহিনীপ্রধান, ডেপুটি সেনাপ্রধান, আইজিপি, বিডিআরপ্রধান, রক্ষীবাহিনীর অস্থায়ী প্রধান ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। বাহিনীপ্রধানগণ প্রত্যেকেই মাইক্রোফোনের সামনে বসে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের লেখা আনুগত্যের শপথ পাঠ করেন, যা বহুবার প্রচারিত হয় বেতার থেকে। বেতারের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরবর্তীকালে (১৯৯৭) *ঢাকা ট্রিবিউন*কে জানান, তিনি ১৫ই আগস্ট বেতারকেন্দ্রে উপস্থিত থাকাকালে মেজর নূরকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ছবিসহ একটি খাম মেজর শাহরিয়ারের হাতে তুলে দিতে দেখেছিলেন যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। (thedailystar.net/August 15, Wikipedia.org / Dhaka Tribune, August 15, 2016).

আমরা এতদিনে বুঝতে পেরেছি, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত ছিল, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সবাই ছিলেন দক্ষিণপন্থি, অনেকেই তৎকালীন ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। এদের বাইরে যারা রয়ে গেছে, তারা কারা? এই নেপথ্য নায়করা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান, সৌদি আরব, লিবিয়া এবং উপমহাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও তাদের এদেশীয় দোসর, মুৎসুদ্দি আমলা ও লুটেরা ধনিক গোষ্ঠী। বঙ্গবন্ধুর অপরাধ, তিনি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, শোষণমুক্ত অর্থনীতি, স্বনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক-বেসামরিক আমলা আর ব্যবসায়ী চক্রের কায়েমি স্বার্থ নির্মূল করার প্রত্যয় নিয়ে এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শে এদেশের সদ্য স্বাধীন অর্থনৈতিক মুক্তিকামী জনগণকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন (র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এম.পি, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা ২০২১, পৃ. ৩)। বঙ্গবন্ধু একাধিকবার চীন সফরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজের শাসন-শোষণের অবসান চেয়েছিলেন। তাঁর 'বাকশাল'

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনিক ও আমলাগোষ্ঠীর একচ্ছত্র ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এদেশের একটি শক্তিশালী স্বার্থবাদী মহল সেটা হতে দিতে চায়নি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে কখনোই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি। তাদের রাষ্ট্রিক পরাজয়ের জন্য তারা একমাত্র বঙ্গবন্ধুকেই দায়ী এবং শত্রু মনে করেছে। তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরিতে এবং 'স্লো পয়জনিং'-এরও চেষ্টা করেছে। তাদের ঘনিষ্ঠবন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সে সময়কার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশ ও সরকার তথা বঙ্গবন্ধুকে সব রকমভাবে বিশ্ব মাঝে ছোটো করার ও অপমান করার কোনো ত্রুটি রাখেনি। চীন, লিবিয়া ও সৌদি আরবও একই পথের পথিক। তাদের এদেশীয় এজেন্সিরা ছিল পাকিস্তানপন্থি পরাজিত বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত-অশিক্ষিত দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্ বাহিনীর লোকজনেরা। তাছাড়া, নেতৃস্থানীয় শান্তিকমিটির সদস্য ও দালালরা বঙ্গবন্ধুর মহানুভব 'ক্ষমা' লাভ করে পূর্ণোদ্যমে প্রকাশ্যে ও গোপনে বাংলাদেশ বিরোধিতায় উঠেপড়ে লেগেছিল। এর বহু প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। শুধু একটা বলি। আমি স্বাধীনতার পর স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় নিজের কানে শুনেছি, বাংলাদেশ টিকবে না। চীন সৈন্য পাঠাচ্ছে আর আমেরিকার ৭ম নৌবহর এই আক্রমণ শুরু করল বলে। সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা ছিল জামাত, মুসলিম লীগ এবং সম্ভবত অন্যান্য ইসলামপন্থি দলগুলো আমার জানা মতে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে কিছু ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের নতুন যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়েছিল। রাতারাতি নতুন একটা সমৃদ্ধিশালী শ্রেণি গড়ে উঠল। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নতুন আর্থ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রয়াস একটা বড়ো শ্রেণির কাছে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের পথে বড়ো কাঁটা হয়ে দাঁড়াল।

দেশ গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। কিন্তু এই স্বল্পতম সময়ে তিনি তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার পথে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন এই ভূখণ্ডটি আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি ধ্বংসস্তূপ। শত শত মাইল রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, রেললাইন, নদী-সমুদ্র-বিমানবন্দর বিধ্বস্ত বা ব্যবহার অযোগ্য; অচল ব্যাবসাবাণিজ্য; শূন্য ব্যাংক-খাদ্যগুদাম-রাষ্ট্রীয় কোষাগার; প্রায় এক কোটি শরণার্থী ও গৃহহীনের পুনর্বাসন; বিচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সহস্র প্রকার সংকট। সে সব দুঃসহ দিনের প্রসঙ্গ স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় বলেন– 'গুদামে খাবার ছিল না, ২৭৮টি রেল, ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল; প্রায় ২০০-৩০০-এর মতো চালের গুদাম নষ্ট করে দিয়েছিল, ব্যাংকের নোট জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আমি আপনাদের কাছে যে কথা বলেছিলাম, এই ধ্বংসস্তূপের ওপর শুরু হয় আমাদের দেশ শাসন। ... আমাকে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ...দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। (ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন: বাঙালির স্বাধীনতা ও সংবিধান', *দৈনিক সমকাল*, ১৭ই মার্চ ২০২০)

বঙ্গবন্ধু তাঁর আকাশস্পর্শী ব্যক্তিত্বের গুণে সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের মুগ্ধ ও প্রভাবিত করে শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। দ্রুতই বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সড়ক-বিমান-নৌ ও রেল যোগাযোগ স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করতে সক্ষম হন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভায় মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ফিরে যায় দেশে। পুনর্গঠিত হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ইরান থেকে তেল নিয়ে আসেন বিনা পয়সায়, রাশিয়া থেকে আসে আধুনিক কৃষি উপকরণ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আদায় করেন অধিকাংশ মুসলিম দেশের স্বীকৃতি। সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন কৃষি খাতকে। কৃষিতে সমবায় খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সম্পৃক্ত করেন কৃষি উৎপাদনে। কৃষিতে বর্তমানে বাংলাদেশের যে শক্তিশালী অবস্থান তার ভিত্তি নির্মাণ করেন বঙ্গবন্ধু। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি গড়ে তোলেন 'সবুজবিপ্লব' আন্দোলন। এ সবই বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী সরকারি সিদ্ধান্ত এবং কৃষিভাবনার অন্যতম কৃতিত্ব (ড. শামসুল আলম, 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষি', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ই মার্চ ২০২০)। তিনি ব্যাংক-বীমা-শিল্পকারখানা এবং ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয়করণ করেন। মাত্র এক বছরের মধ্যে জাতিকে উপহার দেন একটি শ্রেষ্ঠ সংবিধান। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে নিশ্চিত করেন।

বঙ্গবন্ধুর নানা উন্নয়ন কর্ম সম্পর্কে ১৯৭২ সাল থেকেই মনগড়া সমালোচনা ও গুজব ছড়িয়ে তাঁকে খাটো করা হয়েছিল। তিনি উত্তরবঙ্গের ফারাক্কা বাঁধ ও পদ্মায় শুকনো মৌসুমে পানির প্রবাহ যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে দিল্লিতে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে এবং সকল প্রটোকল উপেক্ষা করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ভালো একটা সমাধান করেছিলেন কিন্তু এ নিয়েও তাঁকে অভিযোগ করা হয়। বড়ো সমস্যা ছিল, যাঁরা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকে বহুধাবিভক্ত হয়ে অনেক রকম সমস্যা তৈরি করেন। কেউ কেউ 'আন্ডার গ্রাউন্ডে' গিয়ে সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। তাঁর পিতৃসম রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানীও বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বিশেষত্ব ছিল 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়'। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যতটা পক্ষপাতিত্ব দেখানো স্বাভাবিক ছিল, তিনি বাহ্যত ততটাও প্রদর্শন করেননি; নিরপেক্ষ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। বরং জোটনিরপেক্ষ সংস্থার সঙ্গেই তিনি বেশি সখ্যতা দেখিয়েছেন। এজন্য আমরা দেখেছি, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাত বা যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো অথবা কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিংবা আফ্রিকান নেতা বুমেদিন এবং প্যালেস্টাইনের সংগ্রামী জননেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বিবদমান দুই পরাশক্তির মাঝখানে খাবি খাওয়া অস্থির রাজনৈতিক বিশ্বের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রেখেছিলেন। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ২৫ বছর মেয়াদি পারস্পরিক সহযোগিতাভিত্তিক যে চুক্তি করেছিল, তখন বিরোধীপক্ষরা খুব জোরে শোরে জনমত তৈরির জন্য রীতিমতো কোমর বেঁধে মাঠ গরম করেছিলেন এই বলে যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিলেন। শীঘ্রই এদেশ 'সিকিম'-এর মতো করদরাজ্য হয়ে যাবে। এসব আমাদের নিজের চোখে দেখা। ভারতীয় সৈন্যরা দেশে ফিরে যাওয়ার সময় বলা হলো তারা বাংলাদেশের সব কিছু লুটপাট

করে নিয়ে গেল। যুদ্ধে পরাজিত ও বিজয়ী শক্তির কিছু নির্ধারিত-অনির্ধারিত নিয়ম ও রেওয়াজ থাকে যা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। সেই বাস্তবতা বেশির ভাগ মানুষ সেসময় আমলে নিতে চাননি বলে গোলমাল তৈরির চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধু জনগণের কাছে হাত জোর করে মাত্র তিনটি বছর সময় চেয়েছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটাকে গুছিয়ে আনার জন্য কিন্তু অসহিষ্ণু জনগণ রাতারাতি অনেক কিছু পাওয়ার উদগ্র বাসনায় অধৈর্যে ফেটে পড়েছিল। তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছ থেকেও তিনি খুব যে সহযোগিতা পেয়েছিলেন তা বলা যাবে না। দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে এ রকম জটিল ও ঘোরালো পরিস্থিতিতে একজন সরকারপ্রধানের পক্ষে মাথা ঠান্ডা রেখে দেশ পরিচালনা করা কতটা কঠিন তা সহজেই অনুমেয়।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নূহ-উল আলম লেলিন তাঁর একটি নিবন্ধে লিখেন, আদর্শিক করণে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করলেও তিনি অসীম ক্ষমায় তাঁদের বুকে টেনে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের বলেছিলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশই প্রথম ভিয়েতনামকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারা সে সময় আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু আমেরিকার রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ভিয়েতনামকে নানাভাবে সহায়তাসহ বিনা ভাড়ায় মিশন খুলতে দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থাকে (পিএলও) কূটনৈতিক মর্যাদা দিয়ে ঢাকায় তাদের দূতাবাস স্থাপন এবং বিনা ভাড়ায় বাসভবন বরাদ্দ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন (*দৈনিক সমকাল*, ১৭ই মার্চ বিশেষ সংখ্যা ২০২১)। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গোটা বিশ্বে নিপীড়িত, শোষিত মানুষের কাছেই আদর্শ। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে দক্ষিণ এশিয়া অন্যরকম হতো। তিনি বঙ্গবন্ধুকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ জননেতা হিসেবে অভিহিত করেন। (*দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৭ই মার্চ বিশেষ সংখ্যা ২০২০)

সত্তর-আশির দশকে সমস্ত বিশ্ব ছিল দুটি পরাশক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতের মুঠোয়। তাদের সমর্থনের বাইরে থাকা যে-কোনো দেশের জন্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো বিরোধিতা না করেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন এ দুই শক্তিবলয়ের বাইরে। এই অবস্থান নিশ্চয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা হেনরি কিসিঞ্জার পছন্দ করেনি। তারা বিভিন্ন কার্যকলাপেও তা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে। সুতরাং তারা বঙ্গবন্ধুর ওপর ক্ষিপ্ত থাকবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এ রকম প্রেক্ষাপটেই বঙ্গবন্ধুকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কাছে জীবন বিসর্জন দিতে হলো। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের আগে দুবার তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র ও সরকার ফেলে দেওয়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সতর্ক করে দেয়। 'র'-এর প্রধান আর. এন. কাও এক প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলেন:

> আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদন নিয়ে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা যাই। এই সফরকালে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে শেষ বার দেখা হওয়ার সময় সবার অগোচরে একা তাঁকে বলি যে তাঁর জীবন হুমকির মুখে রয়েছে। তিনি সহাস্যে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ওরা সবাই আমার নিজের ছেলে। আমাকে আঘাত করবে না'। এরই ধারাবাহিকতায় 'র' প্রধান ১৯৭৫ সালের মার্চে আবারও তাঁর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় সতর্ক করে দেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাদের সকল সতর্কতাই উপেক্ষা করেছিলেন (*প্রথম আলো*, বিশেষ সংখ্যা, ১৫ই আগস্ট ২০২১)।

এরও আগে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান করার সময় কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো এক অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, বাংলাদেশ এবং ভারত থেকে আমরা যেসব খবর পাচ্ছি, তাতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি ও আপনার দেশের অবস্থা খুব সুবিধার মনে হচ্ছে না। এ দুটো দেশেই সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টরা খুব তৎপর। বঙ্গবন্ধু বিষয়টি খুলে বলার অনুরোধ জানালে কমরেড ক্যাস্ট্রো বলেন, এক্সিলেন্সি, তাহলে শুনুন। চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দের মতো আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবকেও 'খরচের খাতায়' রেখে দিয়েছি। 'ইউ আর ফিনিশ, এক্সিলেন্সি' (আপনিও শেষ, মহোদয়)। হতবাক বঙ্গবন্ধু পুনরায় জানতে চাইলেন, কমরেড, হঠাৎ এ ধরনের কথা বলছেন কেন? একটু গুছিয়ে বলবেন কি? ক্যাস্ট্রো বলে উঠলেন– Because, you have legalized the defeated administration in Bangladesh, You're finish excellency (কেননা আপনি বাংলাদেশের একটা পরাজিত প্রশাসনকে আইনসঙ্গত করেছেন। এক্সিলেন্সি, আপনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন)– এম.আর আখতার মুকুল, *মুজিবের রক্তলাল*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪। ক্যাস্ট্রোর সাবধানবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসতে না আসতে খবর আসে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছেন প্রেসিডেন্ট আলেন্দে। একই বছরে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের আরেক নেতা ইসরাইলের ঘোরতরবিরোধী সৌদি বাদশাহ ফয়সালও আততায়ীর হাতে নিহত হন। (আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, *প্রথম আলো*, বিশেষ সংখ্যা, ১৫ই আগস্ট ২০২১)

বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বলেছিলেন তাঁর ৩২ নম্বরের বাসভবনটি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি অন্তত রাতের বেলা যেন গণভবনে অবস্থান করেন। তাঁর একটাই উত্তর– বাংলার মানুষের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। আমার প্রতি বাংলার মানুষের ভালোবাসা পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন বলে বাংলার কোনো কারাগারে তো দূরের কথা ক্যান্টনমেন্টেও রাখার সাহস পাননি। সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকেও আমি বলেছি, আমার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো আমি আমার মানুষকে বড্ড ভালোবাসি। আর আমি যা বলি তা বিশ্বাস করি। (*বাংলাদেশ প্রতিদিন*, বিশেষ সংখ্যা, ১৫ই আগস্ট ২০২১)

আমরা বিস্মিত হয়ে ভেবে কূলকিনারা পাই না, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রাষ্ট্রপ্রধান ও গোয়েন্দারা যখন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বহু আগে থেকেই জানতেন, আমাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত ও চরম অর্থসংকটের সময় জনগণের টাকায় বেতনভুক্ত পুলিশ, এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের গোয়েন্দাবাহিনী কেন জানতে পারলেন না ? কী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা ? এর সদুত্তর হয়ত কখনোই জানা যাবে না। 'সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!' জাতির পিতাকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় নৃশংসভাবে সপরিবার হত্যার এমন ঘটনা পৃথিবীর কোথাও সংঘটিত হয়নি। এটি বাঙালির চিরকালের লজ্জা। পরিশেষে প্রয়াত সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর একটি উক্তির পুনরাবৃত্তি করি: '১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুদিবস নয়। তাঁর নবজন্ম, নব অভ্যুদয়ের দিন। তাঁর মৃত্যু নেই'।

প্রফেসর ড. মো. নাজমুল হক : অধ্যাপক (পিআরএল), বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আমার দেখা নয়াচীন: বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ভাবনা

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

ভারত উপমহাদেশে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, নারীর কর্মের জগৎ, নারী এবং পুরুষের নারীভাবনা, যৌনতার মিথ, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতর্কে (discourse) নারীর অবস্থা (condition) ও অবস্থান (position) নিয়ে সৃজনশীল লেখা থেকে শুরু করে বিপুল গবেষণার বিষয় হয়ে এসেছে। সৃষ্টিশীল ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার এই জগতে নারী চিরকালই যে ভিন্নতার অনুষঙ্গে মূল্যায়িত হয়েছে সেই ভিন্নতা শুভ নয়, সমৃদ্ধ নয়, সম্মানজনক নয়, সাম্য ও সমতার নয়। পুরুষের মনোগড়নের মধ্যেই যে নারী চরমভাবে অধস্তন ও অপাঙ্‌ক্তেয় তাই নয়, নারী নিজের মধ্যেও এই ধারণাই লালন করে এসেছে যে, সে পুরুষের সমান তো নয়ই অধিকন্তু পুরুষের দাসানুদাস এবং তার জন্মই হয়েছে পুরুষের আধিপত্য, শাসন-শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন, দয়া ও করুণায় বেঁচে থাকার জন্য। এই পরিস্থিতির মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জগৎ অভিমিশ্র। সেখানে পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল না বা নেই– এমনটা বলা যাবে না। কিন্তু চিরকালই নারীরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এই প্রান্তিকতা সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোতে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে। নারীর গৃহশ্রমের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় না বলে জাতীয় আয়ে তা কখনোই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজে নারীর প্রচুর অবদান থাকলেও নারীকে কৃষকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি কখনো। অর্থাৎ সাংসারিক কর্মযজ্ঞকে উৎপাদনশীল কর্ম হিসেবে বিবেচনা না করায় নারীরা ঐতিহাসিকভাবেই আর্থিক জগতের বাইরে অবস্থান করে এসেছে। ফলে অর্থের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্কের সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। আর এই বঞ্চনার জাত-উপজাত হিসেবে রচিত হয়েছে নারী-আখ্যান।

চীন দেশের নারীরা এই আখ্যানের বাইরে ছিল না। প্রাচীন চৈনিক দর্শনে জিন (yin) এবং জিয়াং (yang)[১] নামে যে অভিধা বহুকাল ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে তার মূলে আছে উপরিউক্ত ভিন্নতার দর্শন। 'জিন' নারীপ্রতিমা। আর তার প্রতীক হলো পৃথিবী, অন্ধকার, নিষ্ক্রিয়তা, শোষণ ইত্যাদি। অন্যদিকে 'জিয়াং' পুরুষপ্রতিমা। এর প্রতীকগুলো হলো স্বর্গ, আলো, সক্রিয়তা, বিচক্ষণতা ইত্যাদি। চীন কমিউনিস্ট পার্টি এই ভিন্নতার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে। বিশেষ করে নারীকে সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও ভোগবাদী জীবনাদর্শ থেকে মুক্তি দিয়ে একটি শোষণ ও বৈষম্যহীন মানবিক পৃথিবীর সদস্য করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে Dr. Clayton Brown যথার্থই বলেছেন,

The latter is significant since, by portraying the Party with masculine yang, and capitalism with feminine yin, the People's Republic of China drew an implicit connection between femininity and the evils of capitalism, imperialism, and individualism. Laboring under such a paradigm, the Party's efforts to promote gender equality were doomed to fall flat.[2]

এখন চীন দেশে নারী-পুরুষ এক সঙ্গেই কাজ করছে সর্বত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চীন ভ্রমণের সময় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার মূলে আছে তাঁর নারীভাবনারই প্রতিফলন।

যে সময় এদেশের মেয়েদের চাকরি-বাকরি ও বাজার-সদাই করার কথা লোকজন চিন্তাও করতে পারেনি সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান একটি লিঙ্গসমতার সমাজ চিন্তা করেছেন– যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। তিনি লিখেছেন, 'সে দেশে পুরুষ কাজ করে আর মেয়েরা বসে বসে খায় না। পুরুষ ও মেয়ে সমান, এই তাদের নীতি। হাজার হাজার শ্রমিক পুরুষ ও শ্রমিক মেয়ে রয়েছে।'[৩]

সাম্প্রতিককালে 'জেন্ডার স্টাডিজ' নামে নতুন একটি জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষের সমতা ও সাম্য সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় এই জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। সমাজ উন্নয়নে নারীর ভূমিকাই শুধু এই জীবনাদর্শের বিষয় নয়, বরং নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্মানজনক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মূলগত বুনিয়াদ নির্ধারণও এর আওতাভুক্ত। আজ থেকে পৌনে একশ বছর পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। সেই সময় ভারত উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে আর কোনো রাজনীতিবিদ বিষয়টিকে এতটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন কি না তা জানা নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই জীবনাদর্শ অর্থাৎ নারী-পুরুষের সমতা (Gender equality)[৪] ও সাম্য (Gender equity)[৫] ভাবনা কতটা সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত ছিল তার নিদর্শন লক্ষ করা যায় আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক জীবনে। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানব উন্নয়ন সূচক নির্ধারণে Gender Related Development Index (GDI)[৬], Gender Gap Index[৭] এবং Gender Equality Index[৮] বিবেচনা করা হয়। নারী-পুরুষের এই সমতার বিষয়টি তিনি

নয়াচীনে জমি বন্টনের মধ্যে লক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'জমি যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; স্বামী জমি যাহা পাবে, স্ত্রীও সমপরিমাণ জমি পাবে এবং দুজনকেই পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, দুজনই জমির মালিক। স্বামী কাজ করবে আর স্ত্রী বসে খাবে এ প্রথা চীন থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি ট্রেন থেকে পুরুষ ও মেয়েলোক অনেককেই হাল-চাষ করতে দেখেছি।'[৯] এখানেই তিনি 'মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে'[১০] পরে আলোচনা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কথাসাহিত্যিক মনোজ বসুও (১৯০১-১৯৮৭) গিয়েছিলেন ঐ শান্তি সম্মেলনে। ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেছেন *চীন দেখে এলাম* নামক গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> এক বর্ষীয়সী স্টেশনে আসছেন– পিঠের সঙ্গে বাচ্চা বাঁধা, আর এক বাচ্চাকে হাতে ধরে হাঁটিয়ে আনছেন। পিছনে এক তরুণী– ছোট বোনই হবে আগের জনের। হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা– ছিমছাম আধুনিকা। কিন্তু কাণ্ড দেখুন– কাঁধে এক বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্তে গন্ধমাদনতুল্য দুই বোঝা। দিন দুপুরে অন্তত পক্ষে শ' দুই-তিন চক্ষুর সামনে প্রকাশ্য স্টেশনের উপর আধুনিকা বাঁকে ঝুলিয়ে বোঝা নিয়ে আসছে– ভ্যানিটি-ব্যাগ বইতে ঘাম বেরিয়ে যায় 'পল্লবিনী-লতেব' ললনা দর্শনে অভ্যস্ত আমাদের দৃষ্টিতে আর পলক পড়ে না। [...] বোঝা বয়ে মেয়েটা একটু যে কাতর হয়েছে, তার কোন চিহ্ন নেই। বরঞ্চ 'রণং দেহি' দৃষ্টি। দাও না আর গোটা দুই বোঝা এর উপর, ডরাই নাকি– চোখে-মুখে এমনি ভাব প্রকট। দুম করে বোঝা নামাল, রাখল সে দুটো সাজিয়ে। হাতঘড়ি এক নজর দেখে টিকিট কাটতে চলল।[১১]

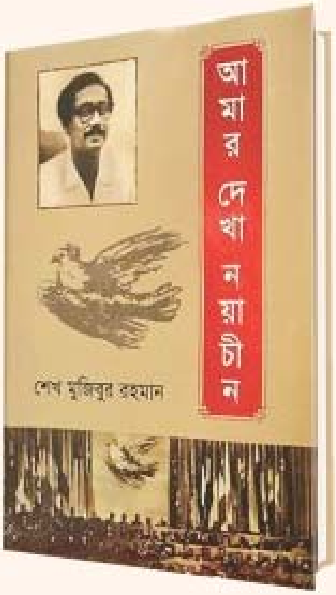

চীনের মেয়েদের এই অগ্রগতি, শ্রমের প্রতি নিষ্ঠা, আগ্রহ ও সম্মানবোধ চীনকে দ্রুততার সঙ্গে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আধুনিক রাষ্ট্রের উচ্চতায় উপনীত করে।

বহুকাল ধরে বৈবাহিক সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে নারীদের যে অসম্মানজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় এবং মেয়েদের পরিবার যৌতুক প্রদান থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে বেদনাদায়ক যে পরিস্থিতির মধ্যে অতিবাহিত করে তার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচয় ছিল আজন্মের। তাই চীন দেশে গিয়ে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিবার সংগঠনের এই মূলগত বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। মনোজ বসু সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছেন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে, একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর নেতার দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি লিখেছেন :

> নয়াচীনে আজকাল পূর্বের মতো মেয়েদের বাবা-মায়ের টাকা দিয়া আর জামাই কিনতে হয় না। তাহারা নতুন বিবাহ আইন প্রবর্তন করেছে। ছেলেমেয়ে একমত হয়ে দরখাস্ত করলেই তাদের যার যার ধর্মানুযায়ী বিবাহ দিতে বাধ্য। 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর স্ত্রী জাতি নিকৃষ্ট' এই পুরানো প্রথা অনেক দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে, তাহা আর নয়াচীনে নাই। আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই আজ নয়াচীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢুকে পড়ছে। পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খোদা সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছে। সুযোগ পেলে তারাও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, ডাক্তার, যোদ্ধা সকল কিছুই হতে পারে। নয়াচীনের বহু পূর্বে পাশ্চাত্য দেশগুলি, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, এমনকি মুসলিম দেশ তুরস্ক নারী স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। নারীরা সেদেশে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। তুরস্কে অনেক মেয়ে পাইলট আছে, যারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পাইলটের মধ্যে অন্যতম।
>
> নয়াচীনের মেয়েরা আজকাল জমিতে, ফ্যাক্টরিতে, কলকারখানাতে, সৈন্যবাহিনীতে দলে দলে যোগদান করছে।
>
> সত্যকথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ না করে তা হলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোনোদিন বড় হতে পারবে না।
>
> নয়াচীনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার কায়েম হওয়াতে আজ আর পুরুষ জাতি অন্যায় ব্যবহার করতে পারে না নারী জাতির ওপর।[১২]

মাও সেতুংয়ের শাসনামলেই চীনে নারী উন্নয়ন ও সমতার প্রশ্ন জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়। বলা যায়, ১৯৪৯ সালে চীন কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতারোহণের পর থেকেই নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান মাও-এর একটি বক্তব্য চীনের নারী জাতিকে মুক্তির অফুরন্ত দ্বারে উপনীত করে। অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী মাও বলেছেন, 'Women hold up half the sky.'[১৩] মৈত্রেয়ী দেবী এর অনুবাদ করেছেন, 'এসো নারী, তুমি অর্ধেক আকাশ।'[১৪] তিনি লিখেছেন, 'এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছিল চীনা নারীশক্তি। তাদের পায়ের বাঁধন অনেক আগেই খুলে গিয়ে থাকলেও মনের বাঁধন তখনো যথেষ্ট খোলেনি। বিপুল কর্মযজ্ঞে সমান দায়িত্ব নিতে গিয়ে তারা নিজের মনুষ্যত্বের ও নিজের শক্তির প্রতি আস্থাবান হলো।'[১৫]

নারী উন্নয়নের এই মহাযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য চীন আইনগত দিকগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করার জন্য দুটি আইন প্রণয়ন করে। *Journal of International Women's Studies*-এ লেখা হয়েছে– First, the Marriage Law outlawed prostitution, arranged marriage, child betrothal, and concubinage. Free marriage and divorce were heavily advocated by the government, along with economic independence for women. Second, the Land Law attempted to mobilize

চীন সফরকালে রাষ্ট্রপ্রধান ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান মাও-জে-দংয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৫৭

women to participate in the labor force by relocating them from rural to urban areas. A concentration of female-oriented labor occurred in the production of textile, silk, and other light industries.[১৬]

নারী উন্নয়নে ও সমতা বিধানে নয়াচীনের অভিজ্ঞতা শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব বাংলার নারীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আইনে নারীদের সমানাধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ ছিল তার পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল লোকের মাঝে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে পুরুষের পায়ের নীচে নারীদের বেহেশত। পুরুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আর মেয়েরা বেহেশতে যাওয়ার আশায় পুরুষদের সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

> তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মেয়েদের নির্ভর করতে হয় পুরুষদের অর্থের ওপর। কারণ আমাদের দেশে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কিছুসংখ্যক মোল্লা পর্দা পর্দা করে জান পেরেশান করে দেয়। কোনো পুরুষ যেন মুখ না দেখে। দেখলে আর বেহেশতে যাওয়া যাবে না। হাবিয়া দোজখের মধ্যে পুরে মরবে। আমার দেশের সরলপ্রাণ গরিব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাদের কথা বিশ্বাস করে আর বেহেশতের আশায় পীর সাহেবদের পকেটে টাকা গুঁজে দেয়, আর তাদের কথা কোরআন-হাদিসের কথা বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইসলামিক [ইসলামের] ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, মুসলমান মেয়েরা পুরুষের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেত, অস্ত্র এগিয়ে দিতো। আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতো। হজরত রসুলে করিমের (সা.) স্ত্রী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা নিজে বক্তৃতা করতেন, 'দুনিয়ায় ইসলামই নারীদের অধিকার দিয়েছে'।[১৭]

বঙ্গবন্ধু কোনো দিনই তাত্ত্বিক ছিলেন না। উত্তর উপনিবেশবাদ (post-colonialism),[১৮] নিম্নবর্গ অধ্যয়নবাদ (subaltern studies),[১৯] লিঙ্গসমতাবাদ (gender studies)[২০] কর্তৃত্ববাদ (hegemony)[২১] এসব তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সমাজকাঠামোর গুরুতর অসঙ্গতিগুলোকে চিহ্নিত করতে ভুল করেননি। তিনি স্পষ্টতই অনুধাবন করেছিলেন যে, ধর্মকে আশ্রয় করে সমাজের সর্বস্তরে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদ (hegemony) প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এবং এই কর্তৃত্ববাদের বলয় গৃহের চার দেয়াল থেকে শুরু করে সমাজের এবং এমনকি রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেও প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করে যাচ্ছে। নারীদের এই কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে না পারলে কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। ফলে চীনে নারী মুক্তির যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার তিনি লক্ষ করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন।

উন্নয়নের প্রশ্নে নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি আজকের পৃথিবীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিসকোর্স। জাতিসংঘ ১৭টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। তার মধ্যে ৫ নম্বর লক্ষ্যে স্থান পেয়েছে লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন[২২] শেখ মুজিবুর রহমান নারীদের সম্মানজনক অবস্থায় দেখতে চেয়েছেন। এর জন্য উৎপাদনমুখী কর্মস্থলে নারীদের প্রবেশগম্যতাকে তিনি উৎসাহব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সকল রক্ষণশীলতাকে নারীদের অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনি নারী স্বাধীনতা, সমতা বিধান ও ক্ষমতায়নের এই বিষয়গুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ (২) স্পষ্টভাবেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ ভেদে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো হয়। নারীর অধিকার সম্পর্কে বলা হয় : 'Women shall have equal rights with men in all spheres of the State and of public life.'[২৩] অনুচ্ছেদ ২৯ (১) বলা হয় : 'There shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office in the service of the Republic.'[২৪] এবং সাম্যের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংবিধানের ২৯ (৩) সংযুক্ত করা হয়: 'Nothing in this article shall prevent the State from –(a) making special provision in favour of any backward section of citizens for the purpose of securing their adequate representation in the service of the Republic;'[২৫] তারই ধারাবাহিকতায় গত একযুগ ধরে মেয়েদের শিক্ষা, অধিকারবোধ, সশস্ত্রবাহিনী থেকে শুরু করে বিচারপতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশায় তাদের অন্তর্ভুক্তি বঙ্গবন্ধুর নারী-পুরুষের সমতা ও সাম্যের আদর্শকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (MDG) বাংলাদেশ অসাধারণ উচ্চতায় উপনীত হয়েছে। এখন নারীর এই সমতা ও সাম্যের সংস্কৃতি পারিবারিক গণ্ডি থেকে শুরু করে কর্মস্থল ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চীনের উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যে পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন তা ঐতিহাসিক। কমিউনিস্ট শাসনের সেই শুরুর দিনগুলোতে শেখ মুজিবুর রহমান নারীদের

উত্থানকে কেন্দ্র করে যে প্রভূত ক্ষমতাধর চীনের আবির্ভাব কল্পনা করেছিলেন আজ তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গত প্রায় একযুগ ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায় থেকে তাঁর সেই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. Eastern thought, the two complementary forces that make up all aspects and phenomena of life. Yin is a symbol of earth, femaleness, darkness, passivity, and absorption. It is present in even numbers, in valleys and streams and is represented by the tiger, the colour orange and a broken line. Yang is conceived of as heaven, maleness, light, activity, and penetration. It is present in odd numbers, in mountains, and is represented by the dragon, the colour azure, and an unbroken line. The two are both said to proceed from the Great Ultimate (taiji), their interplay on one another (as one increases the other decreases) being a description of the actual process of the universe and all that is in it. In harmony, the two are depicted as the light and dark halves of a circle. [https://www.britannica.com/topic/yinyang]

২. Al D. Roberts, mao's, War on Women: the Perpetuation of Gender Hierarchies through Yin-Yang Cosmology in the Chinese Communist Propaganda of the Mao era, 1949-1976, Utah State University, Logan, Utah, 2019, p. iv

৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *আমার দেখা নয়াচীন* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১লা জুলাই ২০২০), পৃ. ৭১

৪. ইউএনডিপি-র ৫ম গোল নির্ধারণ করা হয়েছে জেন্ডার ইকোয়ালিটি নিশ্চিত করার জন্য। সেখানে যেসব লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে তা হলো : 1. End all forms of discrimination against all women and girls everywhere. 2. Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation. 3. Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation. 4. Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate. 5. Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, economic and public life. 6. Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences. 7. Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws. 8. Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women. 9. Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels.

৫. ২০০০ সালে ILO, Geneva কর্তৃক প্রকাশিত *ABC of women worker's rights and gender equality* শীর্ষক প্রকাশনার ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় gender equity বলতে বোঝানো হয়েছে : 'fairness of treatment for women and men, according to their respective needs. This may include equal treatment or treatment that is different but which is considered equivalent in terms of rights, benefits, obligations and opportunities.'

৬. The GDI measures gender gaps in human development achievements by accounting for disparities between women and men in three basic dimensions of human development- health, knowledge and living standards using the same component indicators as in the HDI. The GDI is the ratio of the HDIs calculated separately for females and males using the same methodology as in the HDI. It is a direct measure of gender gap showing the female HDI as a percentage of the male HDI. http://hdr.undp.org/en/content/gender-development-index-gdi

৭. The Global Gender Gap Index seeks to measure one important aspect of gender equality: the relative gaps between women and men, across a large set of countries and across four key areas: health, education, economics and politics. https://data.humdata.org/dataset/global-gender-gap-index-world-economic-forum

৮. The Gender Equality Index is a measurement tool that shows how far (or close) the EU and its Member States are from achieving a gender-equal society. It was developed by the European Institute for Gender Equality (EIGE). The Index produces a score that between 1 and 100. The best situation is 100, where there are no gender gaps combined with the highest level of achievement. https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Equality_Index

৯. শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১০. শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত

১১. মনোজ বসু, *চীন দেখে এলাম* (জার্নিম্যান বুক্‌স, ঢাকা ২০২০), পৃ. ৩০

১২. শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

১৩. Li, Yuhui (2013-01-18). "Women's Movement and Change of Women's Status in China". *Journal of International Women's Studies.* 1 (1): 30–40.

১৪. মৈত্রেয়ী দেবী, *অচেনা চীন* (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা ২০১৯), পৃ. ২৭

১৫. মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাগুক্ত

১৬. Li, Yuhui (2013-01-18). "Women's Movement and Change of Women's Status in China". Journal of International Women's Studies. 1 (1): 30–40.

১৭. শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০

১৮. post-colonialism: Broadly a study of the effects of colonialism on cultures and societies. It is concerned with both how European nations conquered and controlled 'Third World' cultures and how these groups have since responded to and resisted those encroachments. Post-colonialism, as both a body of theory and a study of political and cultural change, has gone and continues to go through three broad stages: 2. an initial awareness of the social, psychological, and cultural inferiority enforced by being in a colonized state. 1. the struggle for ethnic, cultural, and political autonomy. 3. a growing awareness of cultural overlap and hybridity. https://www3.dbu.edu/mitchell/postcold.htm

১৯. 'Subaltern', meaning 'of inferior rank', is a term adopted by Antonio Gramsci to refer to those working class people in Soviet Union who are subject to the hegemony of the ruling classes. Subaltern classes may include peasants, workers and other groups denied access to hegemonic power. https://www.google.com/search?q=subaltern&oq=subal&aqs=chrome.2.69i59j69i57j35i39j0i67l2j69i61l3. 8086j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

২০. Gender studies is a field of interdisciplinary study and academic field devoted to gender identity and gendered representation as central categories of analysis. This field includes women's studies, men's studies, and LGBT studies. Sometimes, gender studies is offered together with study of sexuality. These disciplines study gender and sexuality in the fields of literature, language, history, political science, sociology, anthropology, cinema, media studies, human development, law, and medicine. It also analyzes race, ethnicity, location, nationality, and disability. Gender study has many different forms. One view exposed by the philosopher Simone de Beauvoir said: 'One is not born a woman, one

becomes one'. This view proposes that in gender studies, the term 'gender' should be used to refer to the social and cultural constructions of masculinities and femininities, not to the state of being male or female in its entirety. However, this view is not held by all gender theorists. Other areas of gender study closely examine the role that the biological states of being male or female have on social constructs of gender. Specifically, in what way gender roles are defined by biology and how they are defined by cultural trends. The field emerged from a number of different areas: the sociology of the 1950s and later; the theories of the psychoanalyst Jacques Lacan; and the work of feminists such as Judith Butler. https://www.definitions.net/definition/gender+studies

২১. Hegemony, the dominance of one group over another, often supported by legitimating norms and ideas. The term hegemony is today often used as shorthand to describe the relatively dominant position of a particular set of ideas and their associated tendency to become commonsensical and intuitive, thereby inhibiting the dissemination or even the articulation of alternative ideas. The associated term hegemon is used to identify the actor, group, class, or state that exercises hegemonic power or that is responsible for the dissemination of hegemonic ideas. Hegemony derives from the Greek term hēgemonia ('dominance over'), which was used to describe relations between city-states. Its use in political analysis was somewhat limited until its intensive discussion by the Italian politician and Marxist philosopher Antonio Gramsci. Gramsci's discussion of hegemony followed from his attempts to understand the survival of the capitalist state in the most-advanced Western countries. Gramsci understood the predominant mode of rule as class rule and was interested in explaining the ways in which concrete institutional forms and material relations of production came to prominence. The supremacy of a class and thus the reproduction of its associated mode of production could be obtained by brute domination or coercion. Yet, Gramsci's key observation was that in advanced capitalist societies the perpetuation of class rule was achieved through largely consensual means-through intellectual and moral leadership. Gramsci's analysis of hegemony thus involves an analysis of the ways in which such capitalist ideas are disseminated and accepted as commonsensical and normal. A hegemonic class is one that is able to attain the consent of other social forces, and the retention of this consent is an ongoing project. To secure this consent requires a group to understand its own interests in relation to the mode of production, as well as the motivations, aspirations, and interests of other groups. Under capitalism, Gramsci observed the relentless contribution of the institutions of civil society to the shaping of mass cognitions. Via his concept of the national-popular, he also showed how hegemony required the articulation and distribution of popular ideas beyond narrow class interests. https://www.britannica.com/topic/hegemony

২২. Ending all discrimination against women and girls is not only a basic human right, it's crucial for sustainable future; it's proven that empowering women and girls helps economic growth and development. https://www.undp.org/sustainable-development-goals#gender-equality

২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সর্বশেষ সংশোধিত মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ৮

২৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সর্বশেষ সংশোধিত মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৬।

২৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সর্বশেষ সংশোধিত মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৬।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক

প্রথমবারের মতো প্রশাসনের ২৭ জন কর্মকর্তা ও ৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' পেলেন । আগে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে উৎসাহিত করতে 'জনপ্রশাসন পদক' দেওয়া হতো। এবার নাম বদলে নতুন আঙ্গিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক নামে এ পদক দেওয়া হয়।

২৩শে জুলাই রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৭ জন কর্মকর্তা, তিনটি মন্ত্রণালয় ও একটি ইউনিটের কাছে পদক তুলে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। এবার 'সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা'য় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তি ও দর্শন বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের ধারণা বাস্তবে রূপায়ণ করে 'উন্নয়ন প্রশাসনে' পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক পেয়েছে। 'মানব উন্নয়ন' ক্ষেত্রে দলগতভাবে পদক পেয়েছেন বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, বাগেরহাট মোল্লারহাটের উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. ওয়াহিদ হোসেন, মোল্লারহাটের সহকারী কমিশনার (ভূমি) অনিন্দ্য মন্ডল ও মোল্লারহাটের উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. কামাল হোসেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপ-সচিব কাজী মো. আবদুর রহমান (নেত্রকোনার সাবেক জেলা প্রশাসক), নেত্রকোনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক উপ-পরিচালক (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) হাবিবুর রহমান, নেত্রকোনা খালিয়াজুরির উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এ এইচ এম আরিফুল ইসলাম, খালিয়াজুরির সাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) (বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে সিলেট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে যোগ দেওয়া) নাহিদ হাসান খান ও নেত্রকোনার মদনের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. হাবিবুর রহমান 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' ক্ষেত্রে পদক পান। 'দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলা'য় নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাবেক জেলা প্রশাসক মো. মঞ্জুরুল হাফিজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) এ এইচ এম আবদুর রকিব, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. মো. জাহিদ নজরুল চৌধুরী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. জাকিউল ইসলাম পদক জিতেছেন। 'অপরাধ প্রতিরোধ' ক্ষেত্রে মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক রহিমা খাতুন, গোপালগঞ্জের স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক আজহারুল ইসলাম (মাদারীপুরের স্থানীয় সরকারের সাবেক উপ-পরিচালক), মাদারীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ঝোটন চন্দ, মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার আব্দুল্লাহ-আবু-জাহের দলগতভাবে পদক পেয়েছেন। 'জনসেবায় উদ্ভাবন' ক্ষেত্রে দলগতভাবে পদক পেলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, ঢাকার জেলা প্রশাসক শহীদুল ইসলাম ও সুরক্ষা ডেভেলপার ইউনিট। ভূমি তথ্য ব্যাংকের জন্য 'সংস্কার' ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পদক পেয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। এছাড়া 'গবেষণা'য় বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান ও ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) পারভেজুর রহমান পদক পান। কুমিল্লার ডিসি মোহাম্মদ কামরুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নাজমা আশরাফী, সহকারী কমিশনার ফাহিমা বিনতে আখতার ও নাসরিন সুলতানা নিপা 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' খাতে পদক জিতে নিয়েছেন। নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যক্তিগত অবদানের জন্য ২ লাখ টাকা, দলগত অবদানের জন্য ৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়। দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। দলের প্রত্যেক সদস্যকে স্বর্ণপদক, সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্ট দেওয়া হয় এবং নগদ পুরস্কারের ৫ লাখ টাকা সদস্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হবে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: ইশরাত হোসেন

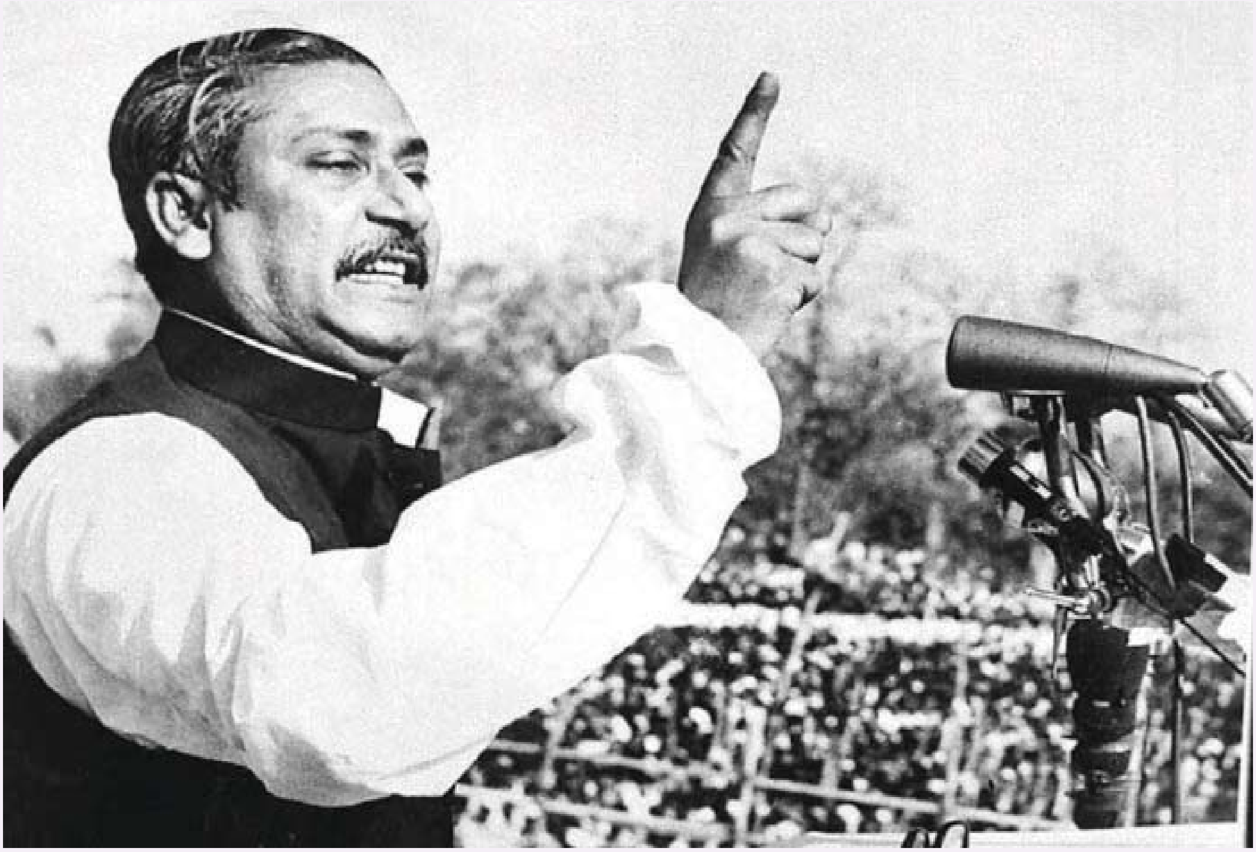

অসমাপ্ত আত্মজীবনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ

মফিদুল হক

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের চার বছর না পেরোতেই বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করে ঘাতকদল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কেবল ব্যক্তি মুজিবের প্রাণ হরণ করেনি, যে আদর্শের জন্য লড়াই করে তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাঙালির সেই জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রাদর্শকে বিসর্জন দেওয়া এবং বঙ্গবন্ধুর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা ছিল ঘাতকদের প্রধান লক্ষ্য। পরবর্তী প্রায় দুই দশকজুড়ে ঘাতকগোষ্ঠী এই কাজ করে গেছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে মুছে ফেলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নাম। সরকারি-বেসরকারি কোনো ধরনের গণমাধ্যমে তাঁর নামোচ্চারণ করা যেত না। তবে লোকস্মৃতি থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম কেউ মুছে দিতে পারেনি বরং কালে কালে তা আরও মহিমান্বিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে একটি বড়ো ভূমিকা পালন করেছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণ। কোথাও যখন বঙ্গবন্ধু নেই, তখন ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ২৬শে মার্চ, ১৫ই আগস্ট, ১৬ই ডিসেম্বর কিংবা ১০ই জানুয়ারি– ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে বঙ্গবন্ধু দ্বারা অনুপ্রাণিত মানুষেরা জনসমক্ষে তাঁর ভাষণের অডিও রেকর্ড কিংবা ক্যাসেট বাজিয়ে নিজেরা শুনেছে, দশজনকে শুনিয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই ভাষণে পাকিস্তানি আমলের শুরু থেকেই শোষণ-বঞ্চনা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিবরণ অসাধারণভাবে চিত্রিত হয়েছে। সব শেষে ছিল অশেষ অনুপ্রেরণামূলক সেই আহ্বান– ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

এভাবেই প্রয়াণের পরও দেশের মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে মিশে ছিলেন শেখ মুজিব। মৃত্যুঞ্জয়ী কেবল নন, জনসংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রেরণা হিসেবে তিনি যে দীপ্যমান হয়ে পথ দেখালেন দেশবাসীকে, বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মকে সেটা এক অনন্য উদাহরণ। এমন রাজসিক প্রত্যাবর্তন খুব কম রাজনীতিবিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

এরপর অনেক টালমাটাল পথ পার হয়ে ২০১২ সালের জুন মাসে প্রকাশ পেল শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত জীবনকথা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, এমন এক পাণ্ডুলিপি যে ছিল তা নিকটজনেরা ব্যতীত আর কেউ জানতো না। ছয় দফা ঘোষণার পর দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণা ও রাজনীতির সংগ্রাম পরিচালনার সুযোগ বঙ্গবন্ধু বিশেষ পাননি। ৮ই মে ১৯৬৬ নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভা থেকে ফেরার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, সেই আটকের বিরুদ্ধে কোনোরকম আইনি প্রতিকারের সুযোগ আর তাঁকে দেওয়া হয়নি। তিনি যে কখনো মুক্তি পাবেন সেই সম্ভাবনা হয়ে এসেছিল ক্ষীণ। এমন এক সময়ে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কারাগারে সাক্ষাৎকালে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাতা প্রেরণ করেছিলেন তাঁর কাছে। অনুরোধ জানিয়েছিলেন স্মৃতিকথা লেখার। এক নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় কারাবন্দির মনে হলো, ‘ঘটনা যতদূর মনে আছে লিখে রাখতে আপত্তি কী? সময় তো কিছু কাটবে। বই ও কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চোখ দুইটাও ব্যথা হয়ে যায়। তাই খাতাটা

নিয়ে লেখা শুরু করলাম।’

এর ফলে রচিত হলো অসাধারণ এক পাণ্ডুলিপি। তবে এই পাণ্ডুলিপি কীভাবে শেষাবধি বই হয়ে বের হলো সে-তো আরেক ইতিহাস। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রাতের অন্ধকারে শেখ মুজিবকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টের সামরিক বন্দিশালায়। পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলাবার আয়োজন সম্পন্ন হয়। শাসকগোষ্ঠীর সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুবের সিংহাসন টলে উঠল, শেখ মুজিব নিঃশর্তভাবে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু হিসেবে জাতির দ্বারা সংবর্ধিত হলেন। তারপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি শক্ত হাতে ধরলেন নেতৃত্বের হাল। ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে তরণী বেয়ে দেশকে পৌঁছে দিলেন স্বাধীনতার মোহনায়। রক্তসাগর পাড়ি দিয়ে দেশ যখন রাহুমুক্ত হলো, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর আর সেই পাণ্ডুলিপির দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ ঘটেনি। পাণ্ডুলিপি আগলে রেখেছিলেন বেগম মুজিব। কিন্তু ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টে স্বামীর সঙ্গে পুত্র-পুত্রবধূ, পরিজনসহ তিনিও আলিঙ্গন করলেন মৃত্যুকে। ঘাতকেরা তছনছ করে দিলো ৩২ নম্বর সড়কের দ্বিতল বাড়ি, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল বঙ্গবন্ধুর আবাস, মানুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে নির্বাসন ঘুচিয়ে সাহসের সঙ্গে যখন দেশে ফিরলেন শেখ হাসিনা, তখনও এই বাড়িতে প্রবেশের অনুমোদন পাননি বঙ্গবন্ধুকন্যা। সেই অনুমতি পেলেন ১২ই জুন সাত্তার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর। গৃহে প্রবেশ করে তিনি শোবার ঘরে কাঠের সাবেকী আলমারির ওপরে হাত দিয়ে খোঁজ করেছিলেন পাণ্ডুলিপির। তিনি জানতেন মা কোথায় সযত্নে রক্ষিত রেখেছেন পাণ্ডুলিপি। সেখানে স্মৃতিকথা, ডায়েরি ও চীন ভ্রমণের বৃত্তান্ত পাওয়া গেলেও আত্মজীবনী পাওয়া যায়নি। ফুলস্কেপ কাগজে কপি করা যেটুকু পাওয়া গিয়েছিল উইপোকার দংশনে তার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। বিস্ময়করভাবে আত্মজীবনীর চারটি খাতা শেখ হাসিনা পেলেন ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর। মৃত্যুর মুখ থেকে শেখ হাসিনার ফিরে আসার সেই সময়ে বঙ্গবন্ধুর এক ফুফাতো ভাই তুলে দিলেন পাণ্ডুলিপি– যা ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণিকে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, বোধ করি কপি কিংবা টাইপ করার জন্য। তারপর অত্যন্ত যত্নে পাঠোদ্ধার করে সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের অন্যতম সেরা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডকে দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রকাশনার। ২০১২ সালের জুনে এভাবে প্রকাশ পায় হারিয়ে যাওয়া এই পাণ্ডুলিপি, বিড়ম্বিত ভাগ্য জয় করে কোনো পাণ্ডুলিপির এমন প্রকাশনা পৃথিবীর ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। লেখক হিসেবেও শেখ মুজিবুর রহমান এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করলেন। তবে তার চেয়েও বড়ো কথা এই গ্রন্থের পাঠগ্রহণ আমাদের ইতিহাসের যুগ-সন্ধিক্ষণ তো বটেই, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তানি শাসন-শোষণের ইতিহাস সম্পর্কে উপলব্ধির নববিস্তার ঘটায়।

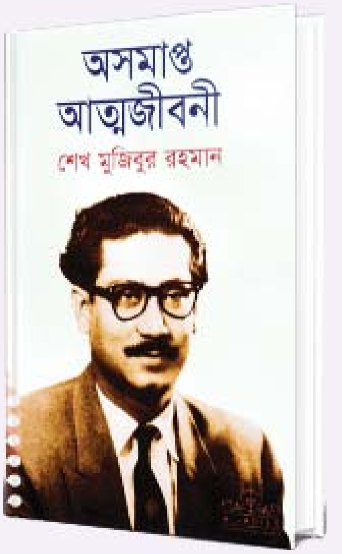

অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের তাৎপর্য নিয়ে সবিস্তার আলোচনা খুব হয়নি। লেখক বর্ণিত ভাষ্য ইতিহাসের অনেক ঘটনার পুনর্মূল্যায়ন ও নতুন বিবেচনা দাবি করে। তিনটি বিষয় আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি এবং এর একটি দিকের ওপর সামান্য আলোকপাত ঘটাবো। প্রথমত প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা ও উপনিবেশ হিসেবে প্রাথমিক টানাপড়েনকে এখানে নতুন আলোকে আমরা দেখি। দ্বিতীয়ত পাকিস্তান সম্পর্কিত ধারণার ভিন্নতর পরিচয় আমরা এখানে পাই। যেমন ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে দিল্লিতে মুসলিম লীগের কনভেনশনে পাকিস্তান ধারণার একটি বিশেষ ভাষ্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সবার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন যা কোনোভাবেই সর্বসম্মত ছিল না এবং শেখ মুজিব জিন্নাহর এই পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন না। তৃতীয়ত ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগস্ট মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র কর্মসূচি ঘিরে যে সর্বাত্মক দাঙ্গা শুরু হয় তা নিয়ে অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ই আগস্টের সারা দিনে তাঁর দেখা বাস্তবতার যে পরিচয় দিয়েছেন, সেখান থেকে আমরা অনেক নতুন তথ্য-প্রমাণ পাই। দাঙ্গায় হানাহানির মধ্য দিয়ে চলেছেন তরুণ মুজিব, যেমন উদ্ধার করছেন উপদ্রুত মুসলিমদের, তেমনি বাঁচাচ্ছেন মুসলিম অঞ্চলে আক্রান্ত হিন্দুদের। এইসব কিছুর মধ্যে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকার যে চিত্র আমরা পাই তা অনেক বিভ্রান্তি মোচনে সহায়ক হবে। কলকাতার দাঙ্গার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে খলনায়ক করে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু এখানে ভিন্ন ভাবনার সুযোগ করে দিয়েছেন শেখ মুজিব।

সর্বোপরি আমরা প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার অন্যতম পরিচয় পাই বঙ্গবন্ধুর বয়ানে, যেখানে ব্যবসায়ী ও পেশাদারি শেখ পরিবারের উর্ধ্বতন পুরুষের সামান্য বর্ণনা রয়েছে, ব্যাবসার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন এবং কোম্পানির শাসনে বিত্ত হারালেও তারা স্বাধীনচেতা অবস্থান সহজে হারাননি।

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ‘শেখ পরিবারকে মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যেতে পারে।’ তারপর লিখেছেন, ‘শেখ বংশ কেমন করে বিরাট সম্পদের মালিক থেকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে গিয়েছিল তার কিছু ঘটনা বাড়ির মুরুব্বিদের কাছ থেকে এবং আমাদের দেশের চারণকবিদের কাছ থেকে আমি জেনেছি। এর অধিকাংশ যে সত্য ঘটনা এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই।’ পারিবারিক ইতিহাস এবং লোকশ্রুতি হিসেবে দু’একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি ইতিহাসের আরেক সত্য মেলে ধরেছেন, ঔপনিবেশিক-পূর্ব সমৃদ্ধ বাংলার কোম্পানির শাসনে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ইতিহাস এবং প্রতিবাদের কাহিনির সঙ্গে তা যুক্ত। ইতিহাসের আরেক পর্বে পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গের নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং তৈরি করেছিলেন ইতিহাস।

এভাবেই *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* আমাদের ইতিহাস উপলব্ধির গভীরতার দিকে নিয়ে যায়। এই তিন বিচারে বলা যায়, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এক অসাধারণ গ্রন্থ, ইতিহাসবিদদের বার বার ফিরে আসতে হবে এই গ্রন্থে, নিতে হবে ইতিহাসের পুনর্পাঠ।

মফিদুল হক: লেখক, গবেষক ও ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

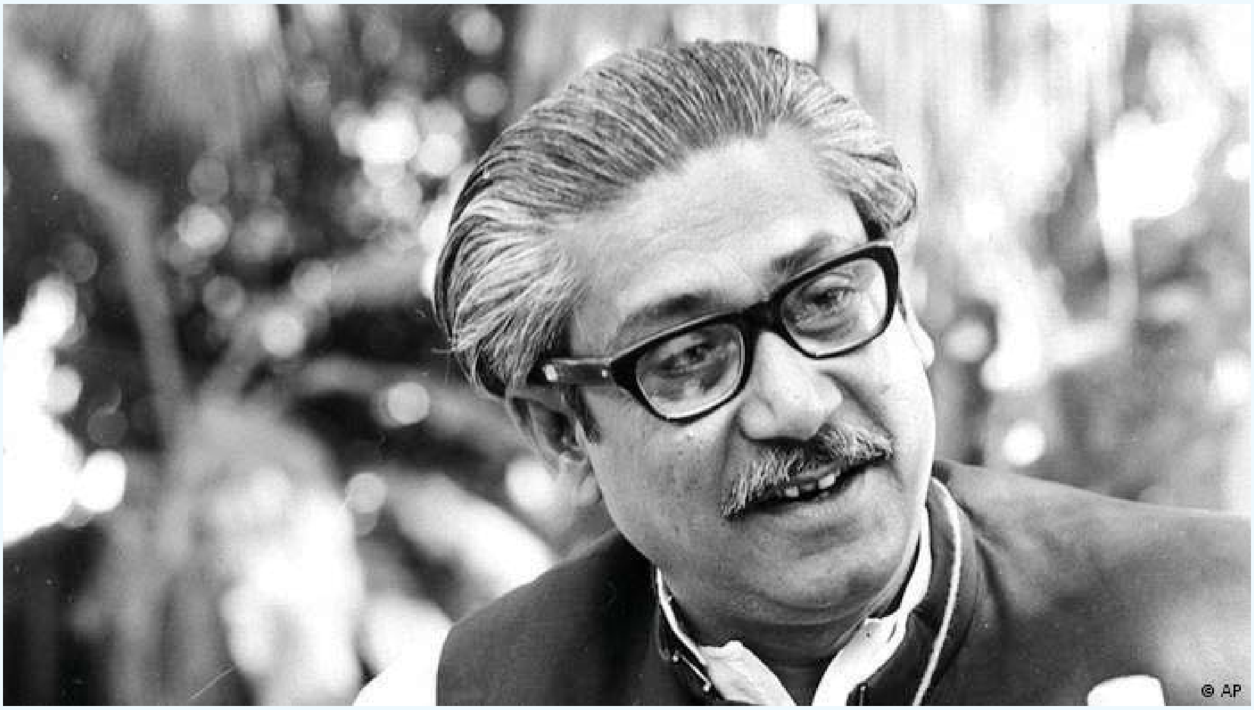

দাওয়াল বিদ্রোহে বঙ্গবন্ধুর অবদান

খালেক বিন জয়েনউদদীন

পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বেদনাময় দিন। এদিনে আমরা হারিয়েছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবার, নিকট আত্মীয়স্বজন ও খুনিদের ছোঁড়া গোলায় বঙ্গবন্ধু ভবনের অদূরে মোহাম্মদপুরে তেরো জন নিরপরাধ স্বজনকে। ১৯৭৫ সালের এদিন দেশি-বিদেশি শত্রুদের গভীর চক্রান্তে বিপথগামী একদল পাকিস্তানপন্থি সেনা এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

প্রায় ৪৭ বছর হলো আগস্টের সেই নির্মম বেদনা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। চার-পাঁচ জন খুনির ফাঁসি হলেও আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম মুজিব, শেখ মণি, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, বেবী, আরিফ, সুকান্ত, রিন্টু, কর্নেল জামিল, মোহাম্মদপুরের শিশু নাসিমা ও পুলিশ কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমানের রক্তের ঋণ পরিশোধ করতে পারি নাই। পঁচাত্তরের খুনিদের মদদদাতা ছিল একাত্তরের শত্রুরা। আর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল খোন্দকার মোশতাক ও মুক্তিযুদ্ধের একজন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী জিয়া।

আমাদের পরম সৌভাগ্য– এত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছি। কারণ বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আমরা স্বাধীনতা-স্বরাজ ও মানচিত্র পেতাম না। বাঙালির দুই হাজার বছরের অস্তিত্ব স্বাধীনসত্তায় পূর্ণতা পেত না। শেখ মুজিবই বাঙালির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শব্দটি বাংলাদেশে ছিল নিষিদ্ধ। এই সময় খুনি ও খুনিদের মদদদাতারা ছিল অবৈধ ক্ষমতায়। একাশির সতেরোই মে বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি শেখ হাসিনা বিদেশে নির্বাসন থেকে স্বদেশে ফিরে এলে নিষিদ্ধ মুজিব স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জনগণ আবার জেগে ওঠে। ছিয়ানব্বই সালে তাঁর দল ক্ষমতায় এলে তিনি আবির্ভূত হন স্বাধীনতাবিরোধীদের মিথ্যার কুহক ছিঁড়ে। এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর একক অবদানের কথা লেখালেখি শুরু করেন দেশি-বিদেশি লেখকবৃন্দ। এ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে হাজার হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নির্মিত হয়েছে ছায়াছবি। প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা তিনটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের গোপন রিপোর্ট, যা হাজার পৃষ্ঠার, কয়েক খণ্ড।

এমন গ্রন্থাদি ও রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, বিশেষ করে পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, মহান ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির বিজয়, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক, স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পাকিস্তানি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর ১৩/১৪ বছরের জেলজীবনের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বঙ্গবন্ধুর জীবনের এক পর্যায়ে ঘটেছিল, তা কেউই উল্লেখ করেননি। আর তা হলো ১৯৪৮ সালের দাওয়াল আন্দোলন বা দাওয়াল বিদ্রোহ। পাকিস্তানিদের জেলজীবনের প্রতিবেদনে সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে তা। অবশ্য বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে তা উল্লেখ করেছেন।

দাওয়াল একটি আঞ্চলিক শব্দ। শব্দটির অর্থ ধান কাটার কৃষিশ্রমিক। এটি বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, বাগেরহাট, কুমিল্লা ও বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে গেরস্থ পরিবারের সাধারণ মানুষেরা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে জনতার অভিবাদনের জবাব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনা, ২৩শে মার্চ ১৯৭১

ব্যবহার করে থাকেন। তবে অঞ্চলভেদে ধান কাটার কৃষিশ্রমিকদের পরবাসীও বলা হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের কথা আমরা অনেকেই জানি। এই মন্বন্তরে উভয় বাংলায় প্রায় অর্ধকোটি মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন। এই মন্বন্তরের রেশ ধরে পাঁচ বছরের মাথায় ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় খাদ্যসংকট দেখা দেয়। তখন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অবাঙালি খাজা নাজিমউদ্দীন। এই সময় গ্রামবাংলায়ও প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বিশেষ করে ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জের কৃষিজীবী মানুষেরা অনাহারে দিন কাটায়। সদ্য পাকিস্তানি স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারে পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ। এই নাজিমউদ্দীনই কর্ডন প্রথা চালুর লক্ষ্যে এক আইন জারি করে। আইনের ধারায় বলা হয়, খাদ্যাভাব নিরসনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদিত জেলার বাইরে নেওয়া বা পরিবহণ করা যাবে না। খাদ্যশস্য জেলার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করবে ফুড কন্ট্রোলার– যা কর্ডন প্রথা নামে তখন পরিচিতি লাভ করে।

সেকালে সিলেট, বরিশাল ও খুলনা জেলায় ধান মৌসুমে প্রচুর ধান উৎপাদিত হতো। এই ধান ক্ষেত থেকে গেরস্থের ঘরে তুলে দিত দাওয়াল নামের কৃষিশ্রমিকরা। কুমিল্লা জেলার কৃষিশ্রমিক বা দাওয়ালরা ধান কাটতে যেত সিলেটে। আর ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জের দাওয়ালরা যেত খুলনা, বরিশাল ও বাগেরহাটে। তারা দলবেঁধে নৌকায় চড়ে ধান কাটতে যেত। ধানকাটা শেষ হলে ধানক্ষেতের মালিক ন্যায্য হিস্যা মোতাবেক একটি অংশ দিত দাওয়াল বা পরবাসীদের। প্রতিবছর আমন মৌসুমে ধান কেটে বাড়ি আসত এবং কোনোভাবে দিনগুজরান করত।

১৯৪৮ সালে কর্ডন প্রথা চালু হলে দাওয়ালরা পড়লেন বিপাকে। বৃহত্তর সিলেট, বরিশাল ও বাগেরহাট থেকে দাওয়ালরা ধান কেটে কুমিল্লা, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জের দাওয়ালদের দিয়ে গেরস্থদের কাছ থেকে ন্যায্য হিস্যা বাবদ প্রাপ্ত বাড়ি ফেরার পথে বাধা দিলো নদীরপাড়ে গড়া গোডাউনের কর্মকর্তারা। দাওয়ালরাও প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। একপর্যায়ে পুলিশরা মারধর করে ধান রেখে তাড়িয়ে দিলো দাওয়ালদের এবং দুশো নৌকো আটক করে রাখে। রিক্ত হস্তে গরিব ও অসহায় দাওয়ালরা ফরিদপুরে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কুমিল্লায়ও এ রকম অবস্থা ঘটে।

এদিকে সবেমাত্র শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনের উন্মেষপর্বে ১৯৪৮-এর ১৫ই মার্চ আন্দোলন করে প্রথম কারাবরণ করে মুক্তি পেয়েছেন। ঢাকায় বসেই তিনি স্বদেশে দাওয়ালদের ধান ও নৌকা আটকের খবর শোনেন। তিনি কৈশোর থেকেই ছিলেন প্রতিবাদী এবং অসহায় মানুষের সহায়। খবর শুনেই লঞ্চে চড়ে গোপালগঞ্জে আসেন এবং অসহায় দাওয়ালদের নিয়ে ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর খুলনায় মিছিল সহকারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে সমবেত হন। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নোয়াখালীর আবদুল হালিম চৌধুরী, পরবর্তীকালে তিনি বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর অন্য পরিচয় তিনি মুনীর চৌধুরী ও কবীর চৌধুরীর পিতা। শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলন ও দাওয়ালদের এহেন অবস্থা দেখে হালিম চৌধুরী বিষয়টি সরকারকে জানাবেন বলে ওয়াদা করেন। কিন্তু দাওয়ালরা ধান আর ফিরে পাননি। এরপর তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর, বাগেরহাট ও বরিশাল অঞ্চলের দাওয়ালদের দাবিদাওয়া ও কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এক পর্যায়ে ছুটে যান সেকালের কুমিল্লার নবীনগর থানার বিভিন্ন অঞ্চলে। তখন ঐ অঞ্চলের গরিব কৃষকরা ধান কাটার মৌসুমে বৃহত্তর সিলেটে জেলায় দাওয়ালগিরি করতে যেত। কিন্তু কর্ডন প্রথার কারণে তারাও বঞ্চিত হতো ন্যায্য হিস্যা থেকে। নবীনগরে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান কৃষক জমায়েত করেন এবং একটি প্রতিবাদী জনসভায় তৎকালীন খাদ্য বিভাগের মহাপরিচালক সিএসপি এম. এন. খানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। অত্যাচারী সরকারকে সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেন। এরপর তিনি ঢাকা হয়ে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ফিরে এসে দাওয়ালদের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে মুজিবের এ আন্দোলন আশপাশের জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর মুজিবকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তার করে ফরিদপুর থেকে। দাওয়াল আন্দোলনের কারণে পাকিস্তানি কারাগারে তিনি ৪ মাস ১০ দিন বন্দি ছিলেন। ছাড়া পান ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি। পরবর্তী সময়ে কর্ডন প্রথা বাতিল হলেও মুসলিম লীগ সরকারের বিধিনিষেধ অব্যাহত ছিল।

এখনও দাওয়ালরা মৌসুমে ধান কাটে এবং এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গিয়ে গেরস্থদের উপকার করে। বৃহত্তর খুলনা ও বরিশাল জেলার দাওয়ালরা বোরো ধান উঠাতে বৃহত্তর ফরিদপুর তথা গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে আসে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে। তবে দাওয়াল শব্দটি অনেকের কাছে অপরিচিত। তারা কৃষিশ্রমিক হিসেবে সুপরিচিত। দাওয়াল আন্দোলনের ইতিহাস প্রাচীনদের কথামালায় এখনও মশহুর। অনেক গান ও কবিতায় সেকালের

ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। সেকালে দাওয়ালদের ধান কাটা, মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার, শোষণ এবং মুজিবের অবদানের কথা চারণকবি শেখ রোকনউদ্দিন গান ও কবিতায় লিখেছিলেন। শেখ রোকন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহচর ও কবি। দাওয়াল আন্দোলনের সময় তাঁর রচিত একটি গান এ রকম, যা এলাকায় লোকমুখে প্রচারিত। গানটির কিছু পঙ্‌ক্তি–

আরে ও দাওয়াল ভাই
চলো চলো আমরা খুলনা যাই
আনবো গিয়ে সোনার ধান আজ ঘরে ভাই
চলো চলো চলো চাষী খুলনা যাই
পথে ঝঞ্ঝা আছে, ভয় কি তাতে
সাথে আছে মুজিব ভাই।
শেখ মুজিবুর থাকলে সাথে, চিন্তা নাই
চলো চলো চলো এবার খুলনা যাই।

কর্ডন প্রথা রহিত হলেও এর রেশ ছিল বহুদিন। খাদ্য বিভাগের লোকেরা অযথা হয়রানি করত হাটবাজারে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অন্ত ছিল না। ১৯৫১ সালে চারণকবি শেখ রোকনউদ্দিন আবার লিখলেন একটি গান। গানটিতে কৃষকদের অসহায় চিত্র ফুটে উঠেছে। গানটি এ রকম–

চাষী মরছি না খাইয়া
ও আজ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি রে
স্বাধীনতা পাইয়া
মরছি না খাইয়া
ধান কাটিতে গেলাম রে ভাই
খুলনা জেলার পরে
ও সে গোডাউনে ধান উঠাইলো
কন্ট্রোলের ব্যাপারে
ও ভাই কন্ট্রোলের ব্যাপারে
আইলাম সবে বাড়ি ফিরা
মহাজনের দেনায় পইড়া রে
ওরে ঘর বাড়ি সব দিলাম ছাইড়া
রাস্তায় রই শুইয়ারে
চাষী মরছি না খাইয়া
শেখ মুজিবুর বলেছিল
ছেড়ে দেও গো ধান
ও সে আমার দেশের দাওয়াল ভাইরে
ভিক্ষা দাও গো প্রাণ, সরকার ভিক্ষা দাও গো প্রাণ।
জালিম সরকার ধান না দিয়া
মুজিব ভাইরে নিল ধইরা রে
তারে তিনটি বছর জেলে রাখল
বিচার না করিয়ারে
চাষী মরছি না খাইয়া।

এই সময় গোপালগঞ্জে জিন্নাহ ফান্ড গঠনের মাধ্যমে অত্যাচার করা হয়েছিল চাঁদা উঠিয়ে। শেখ মুজিব প্রথমে এর প্রতিবাদ করেন এবং নাজিমউদ্দীন গোপালগঞ্জে এলে এ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ ও দাওয়ালদের সমস্যার কথা বলেছিলেন, যা তাঁর আত্মজীবনীতে সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন কৃষক-শ্রমিকদের বন্ধু তথা রাখালরাজা। সারা জীবনই তিনি নিপীড়িত, শোষিত ও অসহায় মানুষের জন্য সংগ্রাম-আন্দোলন করেছেন এবং পাশে দাঁড়িয়েছেন। ৫৫ বছরের আয়ুষ্কালে ১৪টি বছর পাকিস্তানি কারাগারে থেকেছেন। নেলসন ম্যান্ডেলা ছাড়া বঙ্গবন্ধুর মতো এ অঞ্চলে এত দীর্ঘদিন কোনো রাজনীতিকের জেলখাটা হয়নি।

পনেরোই আগস্টের শোক-বেদনা আমাদের শক্তি-সাহস অর্জনের উৎস। স্বাধীনতাবিরোধীরা আজও আড়ালে-আবডালে মুসলিম জাতীয়তাবাদী নামাবলি গায়ে এঁটে বিভ্রান্তি ছড়ায়। বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলোৎপাটন করেছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শিক্ষাই হলো অসাম্প্রদায়িক হওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে মাতৃভূমিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। কারণ বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম, আন্দোলন ও জীবনদানে বাংলাদেশ আরও সজীব হয়েছে। জয় বাংলা।

তথ্যসূত্র

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, ২০১২, পৃ. ১০৩

২। নমিতা খান, *নিরীক্ষা*, জুলাই-আগস্ট ২০১৫, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা

৩। ডা. শেখ সাইফুল ইসলাম শাহীন ও প্রকৌশলী শেখ জাইনুল ইসলাম জইন, *কবিতা ও গানে বঙ্গবন্ধু*, নক্ষত্র, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

খালেক বিন জয়েনউদদীন: সাহিত্যিক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

আইন কমিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধন

জাতির পিতার স্মৃতিকে চিরভাস্বর করে রাখতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের দুর্লভ ছবি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনচরিত ও কর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাবলি সংরক্ষণের নিমিত্তে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্‌বোধন করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। ১৮ই জুলাই রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে অবস্থিত আইন কমিশনে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধন শেষে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান এ বি এম খায়রুল হক ১৫ই আগস্টে শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারী ৩০ লাখ শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এসময় তিনি রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পরিশেষে তিনি দেশের শান্তি এবং উপস্থিত সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন। মোনাজাত শেষে অতিথিদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন এ বি এম খায়রুল হক। শেষে বঙ্গবন্ধু কর্নারে পরিদর্শন বইতে নিজের মন্তব্যসহ সই করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। মন্তব্যে তিনি লেখেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতা ও সংবিধান উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর অবদান চিরকালের। তিনি আমাদের মধ্যে চিরজীবী হয়ে থাকবেন। আইন কমিশনে গণপূর্ত প্রকৌশল বিভাগের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়।

প্রতিবেদন: সীমান্ত হোসেন

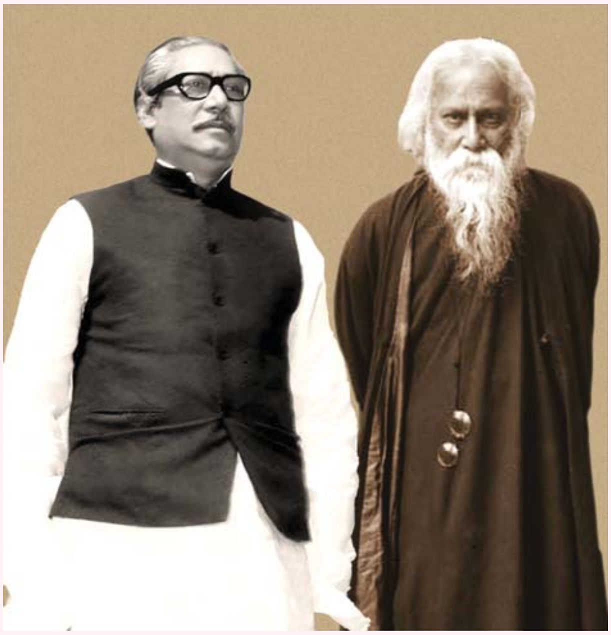

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুপম হায়াৎ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং বাংলাদেশ একসূত্রে গ্রন্থিত। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ৫৯ বছর হলেও বঙ্গবন্ধুর চেতনা, মনন, রাজনৈতিক দর্শন এবং বাংলাদেশ, বাঙালি, বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা জীবন, রাজনৈতিক জীবন, মুক্ত জীবন, বন্দি জীবন, প্রশাসনিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন কবিতা ও গান ছিল তাঁর আশ্রয়। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে ছিল *রবীন্দ্র রচনাবলি*। তিনি যখন জেলে যেতেন তখন সঙ্গে নিয়ে যেতেন রবীন্দ্রনাথের *সঞ্চয়িতা*।

বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় যান, তখন সে বছরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন। কলেজ জীবনে বঙ্গবন্ধু লেখাপড়ার পাশাপাশি রাজনীতি ও ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৭-উত্তর সৃষ্ট পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা ও অন্যান্য শোষণবিরোধী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে জেলেও যেতে হয়। জেল জীবনে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিভিন্ন লেখা তাঁকে প্রেরণা ও সান্ত্বনা জোগায়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কয়েকজন শহিদ হন। বঙ্গবন্ধু তখন জেলে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৫২ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধু করাচি যান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। ঐ সময় যাত্রাপথে গাড়িতে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন আইনজীবীও সঙ্গে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের লেখা কবিতার লাইন শুনিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৯৭)। রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর অধ্যয়ন ও চর্চা যে কত গভীর ছিল এতে তা বোঝা যায়।

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কবিতা এবং গান সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ চীনের রাজধানী পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে যোগ দেন এবং এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি লিখেন:

> কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না? ... পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছেন মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২২৮)।

অধ্যাপক ও সংগীত শিল্পী সনজীদা খাতুন সূত্রে জানা যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কয়েকজন নেতা এসেছেন ঢাকায়। তাঁদের সম্মানে কার্জন হলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সনজীদা খাতুনকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। (*দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা ৫ই মে ২০১৫)। স্মরণযোগ্য, বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন জনের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বাংলাদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আন্দোলন-সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে অবদান রেখেছে। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার বেতার ও টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করে। আর ১৯৬৬ সালে ঘোষিত বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার প্রচার-প্রসারও তখন তুঙ্গে। ঐ সময় আওয়ামী লীগের প্রতিটি অনুষ্ঠানে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাওয়া হতো। ১৯৬৭ সালে জগন্নাথ কলেজের এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করা হয়।

১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ঐদিন বক্তৃতায় রবীন্দ্রসংগীত প্রচার এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় এ সম্পর্কে লেখা হয়:

> বন্দিদশা হইতে সদ্য মুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের দাবি জানাইয়াছেন।

তিনি বক্তৃতায় আরও বলেন,

> আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপিয়র, এরিস্টোটল, দান্তে, লেনিন, মাও সেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন

রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখিয়া যিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু ঐ ভাষণে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ ও রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া ও শ্রবণ সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন:

> আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাহিবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হইবেই।

শেখ ফজিলাতুন নেছা সূত্রে জানা যায়, পাকিস্তানি আমলে বিভিন্ন সময়ে কারাগারে নিঃসঙ্গ জীবনে বঙ্গবন্ধুর আশ্রয় ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য। তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে কবির সুরের বাণী। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন, দুঃখ-দৈন্যের সময় আবৃত্তি করতেন বিশ্বকবির বাণী। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা' অথবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'– এমন অসংখ্য গানের টুকরা তিনি আবৃত্তি করতেন। প্রতিবারই জেলে যাওয়ার সময় তিনি কবির *সঞ্চয়িতা* সঙ্গে নিয়ে যেতেন। (*দৈনিক সংবাদ*, ৮ই মে ১৯৭২)।

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর স্মরণসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার নাম হবে 'বাংলাদেশ' এবং এর জাতীয় সংগীত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

সৈয়দ শামসুল হক সূত্রে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। ঐ সময় তিনি গায়িকা হুসনা বানু খানমকে 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি' রবীন্দ্রসংগীতটি গাইবার অনুরোধ করেন। (উদ্ধৃত– সেলিনা হোসেন, *পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা ২০২০, পৃ. ৪৮)

তোফায়েল আহমেদ সূত্রে জানা যায়, ১৯৭১ সালের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে রবীন্দ্র-নজরুল ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অভয়মন্ত্র। ১৯৭১ সালের সাতই মার্চ রমনা রেসকোর্সের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছিল। (সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫)।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে আসেন। ঐদিন ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে তিনি তাঁর ভাষণে সাহসী-সংগ্রামী-বীর বাঙালির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার চরণ 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী/ রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি' উল্লেখ করেন। (সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১)।

১৯৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' কবিতার প্রথম দশ লাইন জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। এ ছিল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ১৯৭২ সালের ৮ই মে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। ঐ দিন বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের এক বাণীতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তাঁর প্রেরণা ও অবদানের কথা উল্লেখ করেন। (সেলিনা হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। এই সংগীতটি যেন সঠিক ও সমৃদ্ধ সুরে গীত হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি কেবিনেট সভায় নির্দেশ প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। তিনি তাঁর গণভবনস্থ অফিস কক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। কবিতাটি হচ্ছে:

> অবসান হল রাতি
> নিবাইয়া ফেল কালিমা-মলিন
> ঘরের কোণের বাতি...

সংক্ষেপে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত ও কবিতাসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল:

১. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
২. বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
৩. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
৪. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
৫. সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি
৬. নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি দেবার কিছু নাই
৭. চারিদিকে নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে নিশ্বাস
৮. অবসান হল রাতি/নিবাইয়া ফেল কালিমা-মলিন/ ঘরের কোণের বাতি।

উপসংহারে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, আন্দোলন ও স্বদেশ চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও গানের বাণীতে যেমন দীপ্ত রেখেছেন তেমনি বাংলাদেশ রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রায়ণও করতে চেয়েছেন বিশ্ব পরিমণ্ডলে।

অনুপম হায়াৎ: গবেষক ও সাহিত্যিক

আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির রূপকার শেখ মুজিব

কালী রঞ্জন বর্মণ

এ কথা আজ স্বীকৃত ও সুবিদিত যে, বাঙালি একটি সংকর জাতি। কিন্তু বহুকাল পূর্বে আর্য সভ্যতার বাইরে থেকে তারা নিজেদের একটা আলাদা পরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল, সে কথাও আজ ইতিহাসের এক সত্যনিষ্ঠ অংশ। আমাদের জাতিগত পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে অনেক বিলম্বে। নির্দিষ্ট ও একক কোনো ভৌগোলিক সীমানায় নিশ্চিত আবাস গড়ে না ওঠার কারণেই হয়ত এমনটি হয়ে থাকবে। ভূখণ্ডগত বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতার কারণে ভাষাগত অনৈক্য, সমসাময়িক পরিবেশগত বাস্তবতা আমাদের জাতীয় ইতিহাস গঠনকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তাই 'বঙ্গ' শব্দটি প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া গেলেও 'বাঙালি' ও 'বাংলা ভাষা'র পরিচয়টি আমাদের কাছে ধরা দেয় অর্বাচীন কালে।

সামন্তযুগে আমাদের সংস্কৃতিরও ছিল খণ্ডরূপ। কিন্তু একেক অঞ্চলে একেক রকম আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার ও জীবন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে নীরবে, আপন নিয়মে। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে বাঙালি সংস্কৃতির মূল কাঠামোই নির্মাণ হয়েছে এদেশের কৃষি ব্যবস্থা ও নদীনির্ভরতার ওপর। সেখান থেকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির একটি সমন্বিত রূপ বঙ্গসংস্কৃতি হিসেবে পরিণতি লাভ করেছে হাজার বছর ধরে। মূল স্রোতোধারার ব্রাত্যজনের, প্রান্তিক জনের অমার্জিত সেই সংস্কৃতিই শেষতক টিকে গেছে– অভিজাত সংস্কৃতির অনেক মার্জিত উপাদানকে আত্মস্থ করে। তাই বাংলার শাশ্বত সংস্কৃতি মানেই গ্রামবাংলার প্রান্তিক জীবন থেকে উঠে আসা জনসমষ্টির চলমান লৌকিক জীবনধারা, তাদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-আনন্দ, সৃজনভাবনা এবং যা কিছু জাতিসত্তার অভিব্যক্তির উপাদান হিসেবে পরিগণিত।

স্বাধীন সুলতানি আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮) সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহই প্রথম গৌড়, বরেন্দ্রী, সুক্ষ্ম, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো দখল করে ১৩৫২ সালে নিজেকে বঙ্গের সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি সর্বপ্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' বা 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' নামে খ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর মোগল যুগে এসে সরকারিভাবে এই এলাকার নাম হলো সুবেহ্ বাঙ্গালাহ্। ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রাম জয় করার মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলা মোগল শাসনের একচ্ছত্র অধিকারে আসে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'বঙ্গ', 'বাঙ্গালাহ্' বা 'বাঙ্গালী' শব্দের ব্যবহার দেখা গেলেও আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের আগে সুস্পষ্টভাবে 'বাঙালি' বা 'বাঙ্গালী' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না।

এর আগে ১৩০৫ সালে তুর্কী আগমনের পর থেকে মুসলিম শাসনে রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন হলে গণজীবনে তার ছাপ পড়তে সময় লেগেছিল। কারণ ক্ষমতার পালাবদলে রাষ্ট্রশক্তির উত্থান-পতনে লাভ-ক্ষতির প্রভাব পড়ত মূলত রাজবংশের সদস্যগণ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও রাজ-অনুগ্রহপ্রার্থী অভিজাতদের ওপর। প্রজাসাধারণের ভাগ্য তাতে তেমন প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হতো না। তবে স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিতে সর্বপ্রথম একটি ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯) আমলে। জনগণ তাঁকে উপাধী দিয়েছিলেন– 'নৃপতি তিলক' ও 'জগৎ ভুষণ'। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলা শিল্প-সাহিত্যের প্রভূত উন্নতিসহ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে একটি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করে তিনি দেশীয় সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব অবদান রাখেন।

কবি ভারতচন্দ্র রায়ের সময় থেকে 'বাঙ্গালি' নামের পরিচয় পেলেও 'বাঙ্গাল' শব্দটির পরিচয় পাওয়া যায় *চৈতন্য ভাগবতে* এর প্রায় দুশো বছর আগে। এই 'বাঙ্গাল' বলতে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের অথবা ভাটির দেশের লোককেই বোঝায়। পূর্ববঙ্গের লোক ছাড়াও বাঙ্গাল-এর ভিন্ন অভিধায় তখন বোকা, অশিক্ষিত এসবও বোঝানো হতো। এর মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, ইউরোপীয় চিন্তা-দর্শনের প্রভাবে এবং শাসনযন্ত্র পরিচালনার স্বার্থে নতুন আমলাতন্ত্র ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি প্রবর্তনের ফলে একটি নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। এতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের হাজার বছরের উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে তাকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে হয়। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে চেতনার নতুন মেরুকরণ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রেনেসাঁসের প্রভাবও যুক্ত হয় এতে। শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সংস্কৃতি আর গ্রামের অশিক্ষিত ব্রাত্য জনসাধারণের সংস্কৃতিতে অনেকটা ফারাক দেখা দেয়। দেখা দেয় উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ প্রসঙ্গ এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়গত বিভেদও বাদ যায় না।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থন ও সহযোগিতার পেছনে পূর্ববঙ্গের মানুষের যে মানসিকতাটি সক্রিয় ছিল, তা সম্পূর্ণ ধর্মীয় নয়– অনেকাংশে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক। সাংস্কৃতিক ভূমিকাটি বরং সুপ্ত ও চাপা ছিল সময়ের প্রয়োজনে সাময়িক রাজনীতির কর্মকৌশলের অন্তরালে। তবে এ কথাও সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি তার সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন থাকে না, কারণ সংস্কৃতি তার জীবন ধারণের অঙ্গ এবং সমাজ মানসের অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিন্তু বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, অল্প সময়ের ব্যবধানে তা ওলটপালট করে দেয় সবকিছু। এই সময়ের বাস্তবতাকে যেভাবে দেখেছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী– 'ভারতের বিভক্তি ও পাকিস্তানের সৃষ্টি ধর্মের জয় নয়, সাম্প্রদায়িকতার জয়। এই সাম্প্রদায়িকতা এ সময়ে একটি বিরাট ও অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। একে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। এটা রূপ নিয়েছিল একটি রাজনৈতিক বাস্তবতায়। হয়ত সাময়িক বাস্তবতা, কিন্তু সাময়িক বাস্তবতা নিয়েই তো রাজনীতি। কেউ ভুল করেছিলেন বলে কাউকে দোষারোপ করা মূঢ়তা। তখনকার বাস্তবতাকে যাঁরা তখন মেনে নিয়েছিলেন ও পরবর্তী বাস্তবতাকে যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন, পুরনো বাস্তবতা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর, সেই পথিকৃতের মধ্যেই ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং এই নতুন সত্যের প্রধান স্থপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' (*বাঙালীর আত্মপরিচয়*, পৃ. ৪২, কাকলী প্রকাশনী)

পরবর্তীকালে উনিশের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংঘটিত হলো পূর্ববঙ্গে এবং যে আন্দোলনের ফলাফল দ্রুত পালটে ছিল জীবন চেতনা, দৃষ্টির সীমানা; এনে দিলো নতুন মানচিত্র, নতুন ঠিকানা। এই পালটে দেওয়ার পুরো কর্তৃত্বটাই মুজিব নেতৃত্বের। যেহেতু এই পরিবর্তনের একটি সুদূরপ্রসারী ধারাবাহিকতা এদেশের মানুষের শিরায় শোনিতে প্রবাহিত, সেহেতু অনেকেই এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে রেনেসাঁস হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইতালীয় রেনেসাঁসের ঐতিহ্যকে ধারণ করে এক সময় সারা ইউরোপ জাগরিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে প্রভাবিত হয়েছিল সারা বিশ্ব। তারই ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁস বিকশিত হয়েছিল, বাংলাদেশের এই রেনেসাঁস তারই উত্তরাধিকার। এই রেনেসাঁস সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় যেমন বলেন– 'এতকাল আমরা যেটাকে বাংলার রেনেসাঁস ঠিক করেছি, বা ভুল করেছি সেটা ছিল অবিভক্ত বাংলার ব্যাপার। পার্টিশনের পর পূর্ব বাংলা– এখন তো বাংলাদেশ– নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা যায় দ্বিতীয় এক রেনেসাঁস। প্রথম রেনেসাঁসের নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রিষ্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁসের নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। এবার তাঁরা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম রেনেসাঁস ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকা কেন্দ্রিক। ... বাংলার রেনেসাঁস না বলে এর নাম রাখা যাবে বাংলাদেশের রেনেসাঁস।' (*বাংলার রেনেসাঁস*, ২য় সংস্করণ ১৯৮০, ভূমিকা)

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দুরা কেবল নিজেদেরই বাঙালি বলে শনাক্ত করলেও কিছুদিনের মধ্যেই তারা আর ষোলো আনা বাঙালি থাকলেন না। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে– 'তারা আট আনা ভারতীয় এবং চার আনা বাঙালি হয়ে থাকলেন, তাও পুরোপুরি নয়।' পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকদের পূর্ববঙ্গের 'বাঙাল'দের প্রতি অবহেলা এবং শহুরে শিক্ষিত উর্দুভাষী মুসলমানদের উন্নাসিকতার কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা আগে নিজেদের বাঙালি বলে চিহ্নিত না করলেও দেশবিভাগের কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ক্রমবিকাশমান এই আত্মপরিচয়ের আগ্রহের কারণ ও সমকালীন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ বলেন, 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলার এই মনোভাব দেখা দিতে আরম্ভ করে। যেমন মুসলমানরা নিজেদের বাঙালি পরিচয় নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে শুরু করেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংগীত তাঁদের এই গর্বের একটা প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত হলো। ... যে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি মুসলিম সমাজ কোনোদিন ঠিক প্রসন্নমনে আপনজন অথবা নিজেদের কবি হিসেবে গ্রহণ করেননি, সেই রবীন্দ্রনাথকেই পরিবর্তিত পরিবেশে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ভালোবাসলেন এবং নিজেদের লোক বলে মেনে নিলেন। কেবল তাই নয়, এ সময়ে তিনি পূর্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হলেন। (*বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য*, পৃ. ৭০, ৭৯, প্রথমা প্রকাশন)

১৮৬৭ সালে কলকাতায় বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বৎ সমাজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'হিন্দু মেলা'র ইতিবাচক যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির অবিন্যস্ত অংশকে সংহত করে তার বিকাশ সাধনের জন্য কোনো বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুমিত ভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে হায়াৎ মামুদ বলেন: 'রবীন্দ্রনাথ, আমার অনুমান, জানতেন যে, যে-কোনো জনগোষ্ঠীতে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ অবিন্যস্ত ও অসংহত অবস্থায় ছড়িয়ে থাকে, সেই এলোমেলো সংস্কৃতি-উপাদান সংহত করার কাজ সব জনগোষ্ঠীতেই সম্পন্ন করে থাকেন সমাজেরই কোনো-না-কোনো শ্রেষ্ঠ মনীষা; কিন্তু এ বিন্যাস ও সংহতির আয়োজন এত জটিল ও বৃহৎ যে কেবল একক প্রচেষ্টায় তা সিদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন জাতির কোন বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫) হায়াৎ মামুদের এই অনুমিত ভাবনা রবীন্দ্রনাথের চেতনাসঞ্জাত হলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতো বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের সাথে বাঙালি জাতিকে যুক্ত করার শ্রেষ্ঠ মনীষা যাঁর, তিনিই সেই সিদ্ধ পুরুষ– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতিকে সংহত করেছেন, তাকে পরিচ্ছন্ন অবয়ব দিয়েছেন; কিন্তু জাতির কোনো বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে বিকশিত ও মুক্ত করার সুযোগ তিনি পাননি। বাস্তবে সে অবকাশও ছিল না। তাঁর এই অসমাপ্ত কাজটি পরবর্তীতে সমাপ্ত করতে সমর্থ হয়েছেন শেখ মুজিব। তিনি তাঁর মেধা ও মনন দিয়ে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আপন হৃদয়ে ধারণ করে পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার প্রতিজ্ঞায় বাংলা সংস্কৃতিকে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল এবং ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চার করে তাকে নতুন রূপে পরিচালিত করেছেন; এজন্যেই তিনি আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির রূপকার।

পরিবর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাজনৈতিক কৌশলে একটি জাতিকে সর্বাত্মক গণযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করানোর যে শক্তি ও সাহস তিনি অর্জন করেছিলেন তার জন্য তাঁকে জীবনের নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। আর এর সূচনা হয়েছিল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকেই, যেখানে তাঁর জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চে। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় শেখ মুজিবের চোখের অসুখ হয়। এ কারণে তিন বছর তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু তাই বলে তাঁর জীবন শিক্ষা থেমে থাকেনি। এ সময় তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন, যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে। তাঁর নিজ গ্রাম টুঙ্গিপাড়ার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পান তিনি এ সময়ে। নিম্নবর্গীয় মানুষের যাপিত জীবন, স্থানীয় জোতদার-মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের ইতিহাস-ভূগোল, ভূমি সর্বস্ব নিস্তেজ নিরীহ মানুষের দারিদ্র্যের হাহাকার আর ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্ঠুরতা অনুভূতির নতুন দিগন্তে নিয়ে যায় তাঁর চেতনাকে।

অসাম্প্রদায়িক মনোভূমির লালন ও চর্চা শুরু হয়েছিল তাঁর শৈশব

ও কৈশোরে, পরিবারে ও স্কুল জীবনে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা হতো বাড়িতে– যা তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি বলেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। *আনন্দবাজার*, *বসুমতি*, *আজাদ*, *মাসিক মোহাম্মদী* ও *সওগাত*। ছোটোকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম।' তিনি আত্মজীবনীতে আরও লিখেন: '... আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান– সবই চলত।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১০, ১১)। শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি নয়; তার সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষানুরাগ, জ্ঞানচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চাকে তিনি উৎসাহিত করতেন সেই ছাত্রজীবন থেকে। তাইতো ১৯৪১ সালে ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা সম্মেলনে বড়ো বড়ো রাজনীতিকদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, কবি ও বুদ্ধিজীবীদের তিনি আমন্ত্রণ জানান। সেখানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির ও ইব্রাহিম খাঁ সাহেব। সেদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেন: ... 'কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন। আমরা বললাম, এই কনফারেন্সে রাজনীতি আলোচনা হবে না। শিক্ষা ও ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬)

শেখ মুজিব বাংলা সংস্কৃতির মুক্ত বিকাশের লক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত দেশ ও উপযুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপযোগী ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণা দিয়েছেন এবং নির্ভয়ে কাজ করার সাহস জুগিয়েছেন। তাঁর এই ভাবনা ও মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বলেন, 'মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতোধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মধ্যে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১)

একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনে শেখ মুজিব কেবল রাজনীতিকেই একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেননি, এদেশের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এভাবেই সমন্বিত সংগ্রামের স্রোতোধারা স্বাধীনতার শান্তি পারাবারে এসে মিলিত হয়েছে। তাঁর এই বহুধা বিস্তৃত সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'রাজনৈতিক সত্তাই বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় পরিচয়। তবে শুধু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তিই নয়, বাংলাদেশের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মুক্তি সংগ্রামেরও অন্যতম নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বস্তুত তাঁর সাধনার মধ্য দিয়েই ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি রচিত হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়ও তিনি পালন করেছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।' ('বঙ্গবন্ধুর ভাষা ও সাহিত্য চিন্তা', *কালের কণ্ঠ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২০, বিশেষ সংখ্যা)

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক চেতনা মারাত্মকভাবে নাড়া দেয় পূর্ববঙ্গের জনগণকে। তারই প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫৪-এর নির্বাচনে বাঙালির মনোভাবের বিজয় চিহ্নিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রে কয়েক মাসের ব্যবধানে বাঙালিরা ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং দমন-নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। সংকট আরও ঘনীভূত হয় ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হয়ে যায়; কিন্তু সাহস হারায় না। শক্তি জোগায় তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মূর্তিমান প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা তারা অতিক্রম করতে থাকে সেই শক্তির অনিরুদ্ধ প্রাণাবেগে। বাঙালি সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সেই সময়ের প্রতিবাদী বাঙালির অবস্থানটি সেলিনা হোসেন *পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিবুর রহমান* গ্রন্থে এভাবে তুলে ধরেন– 'কিন্তু প্রতিবাদী বাঙালিকে দমন করার সাধ্য ছিল না পাকিস্তান সরকারের। রবীন্দ্রনাথকে বাঙালির সাংস্কৃতিক বলয় থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের মতো রাজনৈতিক নেতা, তেমন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ, ছিলেন শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-চলচ্চিত্র জগতের বোদ্ধা মানুষেরা। ছিলেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিকর্মী।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২)। এরপর একই গ্রন্থে বাংলা সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবনা ও ভালোবাসা সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জনমানসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন আপন রাজনৈতিক চিন্তার আলোকে। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর শক্তির হাতিয়ার। ছিলেন অনিঃশেষ অনুপ্রেরণার উৎস। পূর্ববঙ্গের প্রতি বৈষম্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণের চেতনার দরজায় করাঘাত করেছেন দেশ-মাতৃকার বন্দনার মাধ্যমে। রাজনীতির ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ যেমন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী ও সুর শুনিয়ে মানুষের চোখে জল ঝরিয়েছেন। এমন জাদুকরী বাস্তবতা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির। পাকিস্তান আমলের পুরো সময়জুড়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতির বলয়ে এভাবে এগিয়েছে পূর্ববঙ্গের মানুষ। ... এই প্রেরণার উৎস দ্বারা পূর্ববঙ্গের বাঙালির মানস দিগন্তে জলের মতো ঝরেছেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিতজন তাকে ধারণ করেছিলেন সংস্কৃতির সবটুকু আলোর ছায়ায়।...এই মানুষকে পূর্ববঙ্গের গণমানুষের সামনে নিয়ে এসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেতনাকে বুঝিয়েছিলেন দেশমাতৃকার 'বদন মলিন হলে' কী দায়িত্ব পালন করতে হবে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮, ৪৪)

'পূর্ব বাংলার' প্রতি শেখ মুজিবের ভালোবাসা ছিল আপন অস্তিত্বের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। এই নামের বিকৃতি বা বিলুপ্তি তাঁর কাছে ছিল আপন অস্তিত্ব হারানোর মতো বেদনার। তাই ২৫শে আগস্ট ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববাংলা নামের বিলুপ্তির বিরোধিতা করে তিনি বলেন: Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make it 'Bengal' (Pakistan). The word 'Bengal' has a history, has a tradition of it's own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. (মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৮৬)

সংগ্রামের এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় সেই বেদনা ও মনোভাবের কথা তিনি ভোলেননি; বরং তাঁর মনোবল, আত্মপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়েছে। তাই ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসের এক আলোচনাসভায় শেখ মুজিব বলেন: 'এক সময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বাংলা কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।' (মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৭)

১৯৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে 'পূর্ব পাকিস্তান সংগীতশিল্পী সমাজ' কর্তৃক শেখ মুজিবের জন্য এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বাংলার নতুন শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ২৫শে জানুয়ারি 'দৈনিক আজাদে' প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল এ রকম:

> ১৯৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান সংগীতশিল্পী সমাজ শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংবর্ধনার আয়োজন করে। শিল্পীদের পক্ষ থেকে মানপত্র প্রদান করেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী আবদুল আহাদ। তিনি শেখ মুজিবকে 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' বলে নন্দিত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। তিনি বলেন– 'দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য সংগীতে, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতি। ... মানুষের মনে প্রেরণা জোগাতে হবে। যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধা মুক্তির জন্য ৭ কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে।'

সেদিনের সেই ভাষণে পূর্ববঙ্গের জনগণের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সমান গুরুত্ব আরোপ করে গণমানুষের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকারে তিনি এক নতুন ও আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির ভিত রচনার ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন।

আবহমান বাংলায় হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক প্রতিভাবান বাঙালি এসেছেন; এসেছেন ভুসুকু থেকে ভারতচন্দ্র, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর থেকে চিত্তরঞ্জন, মধুসূদন থেকে নজরুল এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা পর্বতপ্রমাণ সাফল্য রেখে গেছেন। তাঁদের প্রতিভা, শ্রম ও নিষ্ঠা বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্যকে অপরিমেয় সমৃদ্ধি দান করেছে। তাঁদের বিশ্বাস ও আদর্শে, চিন্তা ও কর্মে, শ্রম ও নিষ্ঠায় চেতনাগত ঐক্যের ফারাক তেমন না থাকলেও তাঁদের স্বপ্ন ও কল্পনা এবং দূরাগত লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হওয়ায় তা সমন্বিত শক্তিতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার অবকাশ ছিল না। এছাড়া পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি, সমকালীন বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ধারা এবং রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক আনুকূল্যের অভাবে হয়ত এই সংস্কৃতির সমন্বিত প্রবাহ দুকূল ছাপিয়ে বিস্তার লাভের আগেই তা হারিয়ে গেছে।

হাজার বছরের আরাধ্য সেই অসমাপ্ত কাজটি বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে সমাপ্ত করলেন শেখ মুজিবুর রহমান একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে– যার নাম বাংলাদেশ। গোলাম মুরশিদের ভাষায়: 'বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম দিয়ে মুজিব যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন, বাঙালি সংস্কৃতির ভাবী পথ নির্মাণের তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে বাঙালিরা চিরতরে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দেয় স্বাধীন দেশ– বাংলাদেশে। সেই পথ ধরে বাংলাদেশে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত তথা সমগ্র বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাই স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন শেখ মুজিব। তাঁর চেয়ে অনেক প্রতিভাবান বহু বিখ্যাত বাঙালি গত এক হাজার ধারায় অত বড় মোড় পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারেননি। এ কারণে, তিনি সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি।' (*মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*, পৃ. ২০২, প্রথমা প্রকাশন)

কালী রঞ্জন বর্মণ : কবি, লেখক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব

পদ্মা সেতু ভ্রমণ প্যাকেজ ট্যুর চালু

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পদ্মা সেতু ভ্রমণ প্যাকেজ ট্যুর চালু হয়েছে ২২শে জুলাই। পর্যটন ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এ প্যাকেজ ট্যুরের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গে পর্যটনের উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ এখন স্বল্প সময়ে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবনসহ দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করতে পারছেন। পদ্মা সেতুর উভয় পার্শ্বে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, পদ্মা সেতু আমাদের ইতিহাসের অংশ। এ সেতু বিশ্বে বাঙালি জাতিকে বিশেষ অহংকার ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে এ সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গসহ সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে গতি ও সমৃদ্ধির সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের আয়োজনে 'স্বপ্নের পদ্মা সেতু ভ্রমণ' শীর্ষক প্যাকেজ ট্যুরটি প্রতি শুক্র ও শনিবার নিয়মিত পরিচালিত হবে। এই ভ্রমণের মাধ্যমে পর্যটকগণ দিনের আলোতে যেমন পদ্মা সেতুর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন, তেমনি সন্ধ্যা ও রাতের আবহে পদ্মা সেতুর অপরূপ শোভাও উপভোগ করতে পারবেন। আগ্রহী ভ্রমণকারীগণ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ০১৯৪১৬৬৬৪৪৪, ০১৩০০৪৩৯৬১৭ ও ০২-৪১০২৪২১৮ নম্বরে যোগাযোগের মাধ্যমে বুকিং নিশ্চিত করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

বঙ্গবন্ধুর মানবিকতা

সৈয়দা নাজমুন নাহার

শৈশব থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত হতেন। অভাবী মানুষদের মুক্ত হস্তে দান করতেন। এতে সায় ছিল বাবা শেখ লুৎফর রহমান ও মহীয়সী মা সায়েরা খাতুনের। ছাত্রজীবনে নিজের বইপত্র অভাবী ছাত্রদের, এমনকি গায়ের চাদর, জামা শীতার্ত মানুষদের বিলিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

পৃথিবীর কোনো দেশেই রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবন উন্মুক্ত থাকে না সর্বসাধারণের জন্য। ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পরও জনগণের প্রতি ভালোবাসার টান কমেনি বরং আরও বেড়ে যায়। তিনি যখন সরকারপ্রধান তখনও ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটির কোনো জৌলুস বাড়েনি, উঁচু করা হয়নি বাড়ির বেষ্টনী প্রাচীর। আগের মতোই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। যার যখন খুশি দেখা করতে পারত। আমাদের আর কোনো নেতার বাসভবনে নির্দ্বিধায় প্রবেশাধিকার ছিল না, আজও নেই।

বঙ্গবন্ধুর ঘাড়ের কাছে গলায় ছোটো অপারেশন হয়, হাসপাতাল থেকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় অশীতিপর এক বৃদ্ধা খালি পায়ে লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে আসেন, তার প্রিয় নেতাকে একবার চোখের দেখা দেখতে। খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু নেমে আসেন। বঙ্গবন্ধুকে দেখে বৃদ্ধা দাঁড়াতে গেলে বঙ্গবন্ধু মানা করেন। এ যেন এক মাতা-পুত্রের মিলন। দেশের সাধারণ মানুষের ভালোবাসার জন্যই পেয়েছিলেন 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার। তথ্যসূত্রে জানা যায়, এই বৃদ্ধা নারীটি ছিলেন রমনা কালীবাড়ি আশ্রমের অধিবাসী এবং শহিদ পরিবারের সদস্য।

গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকা বা কলকাতা যাতায়াতের মাধ্যম নৌপথ। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ থেকে স্টিমারে করে ঢাকায় আসতেন। সদরঘাটে নামতেন, ঘাট পাড়েই আর পাঁচটা হোটেলের মতো হাবিব মিয়ার একটি হোটেল ছিল। বঙ্গবন্ধু এই হোটেলে উঠতেন টুঙ্গিপাড়া থেকে আসতে-যেতে। অনেক সময় মিটিংও করতেন। তরুণ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পর্যন্ত। হাবিব মিয়াকে তিনি হাবিব ভাই বলতেন। আন্তরিকভাবে হাবিব মিয়াও সেবা দিতেন বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে। বঙ্গবন্ধু সেই আন্তরিক ভালোবাসাকে ভোলেননি। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু একদিন রাতে গাড়ি পাঠিয়ে হাবিব মিয়াকে নিয়ে আসেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে। দুর্দিনের স্বজন হাবিব মিয়াকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেন। যথাযথ আপ্যায়ন করা হয় তাঁর প্রিয় হাবিব ভাইকে। বঙ্গবন্ধু হাবিব মিয়ার কাছে জানতে চান তার কী চাই। তিনি তার জন্য কিছু করতে চান। বঙ্গবন্ধুর এই কথা শুনে নির্লোভ হাবিব মিয়া বলেন, 'আমার কিছু চাই না, আপনি আমাকে মনে রেখেছেন আমার খোঁজ করে এনেছেন সাথে করে, চা খাওয়ালেন– আর কী চাই।' যেমন নেতা তেমনি তাঁর ভক্ত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চেতনার মূলে ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর ভাষণের ভাঁজে ভাঁজে থাকত কবিদ্বয়ের কবিতা। ক্ষমতার শীর্ষে যখন রাষ্ট্রপ্রধান, তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে ভুলে যাননি। তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করে, কবিকে সপরিবার বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তাঁর জন্য বাড়ি বরাদ্দ করেন, সকল রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। পরিবারের ব্যয়ভার সরকার থেকে বহন করা হতো। কবির জ্যেষ্ঠপুত্রের পরিবার থাকলেও কবির কনিষ্ঠপুত্রের পরিবার ফিরে যায় কলকাতায়। কিন্তু কবিপুত্র সব্যসাচীর পরিবারে আজও বিদ্যমান একই মর্যাদায়। বঙ্গবন্ধুই কবিকে জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করেন। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি যখনই কবিকে দেখতে যেতেন তাঁর সামনে শ্রদ্ধায় মাটিতে বসে পড়তেন। একজন রাষ্ট্রপ্রধান একজন কবির প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন তা ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

দেশের শিল্পী, সাহিত্যিকদের প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল অসীম মমত্ববোধ। স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠশিল্পী সরদার আলাউদ্দীনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো গেল না। মৃত্যুর পর তাঁর বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্যদের ডেকে নেন বঙ্গভবনে। বলেন, আপনাদের এক ছেলে চলে গেছে, আমি তো আছি, কাঁদবেন না– বলে দেয়ালের দিকে মুখ করে নিজেই ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলেন। সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ বেতার থেকে বাজছিল সর্দার আলাউদ্দীনের গাওয়া 'পাখি উড়ে যাবে' গানটি। শিল্পীর পরিবারকে আবাসন ব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। মানুষের বিকল্প হয় না কিন্তু যারা বেঁচে আছেন তাদের গুরুত্ব কম ছিল না বঙ্গবন্ধুর কাছে।

ষাট দশকের মেধাবী কবি আবুল হাসান অসুস্থ হলে, তাঁর চিকিৎসার জন্য লেখক কল্যাণ সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কবির সুচিকিৎসার জন্য তাঁকে সুদূর বার্লিনে প্রেরণ করেন। দেশে ফিরে আসার পরও তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন। কিন্তু এতকিছু করেও কবি আবুল হাসানকে বাঁচানো গেল না। ক্ষণজন্মা এই নক্ষত্রের কাব্যপ্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। *রাজা যায় রাজা আসে*, *যে তুমি হরণ করো*, *পৃথক পালঙ্ক কবি* তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

লোকসংগীতের কালজয়ী কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলীম অসুস্থ হলে বঙ্গবন্ধু তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। সরকার থেকে তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হয়। কিন্তু মরমি গানের এই মহান শিল্পীকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মিত সহায়তা প্রদান করেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে আল মাহমুদ অনেকটা সময় কারাগারে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে ফিরে সবার খোঁজখবর

করেন, আল মাহমুদ জেলে জেনে তাঁকে তাৎক্ষণিক ছাড়িয়ে আনেন। বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে এনে তাঁর হাতে তিন হাজার টাকা তুলে দেন আর বলেন, আগে সংসারটা ঠিক কর। তারপর দেখতাছি। ক্লাস এইট পাস আল মাহমুদকে শিল্পকলায় চাকরি দেন। সেখান থেকে উপপরিচালক হিসেবে অবসরে যান। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই– *সোনালী কাবিন*, *কাবিলের বোন*, *পানকৌড়ির রক্ত।*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যে কেউ সমস্যা নিয়ে গেলে তিনি তাৎক্ষণিক তার সমাধান নিশ্চিত করতেন। তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পিতৃপরিচয় দেন। তাদের ঠিকানা বলেন ৩২ নম্বর ধানমন্ডি, ঢাকা। তাদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেন। বেকার তরুণদের উৎসাহিত করেন তাদের বিয়ে করার জন্য। বিনিময়ে আর্থিক নিরাপত্তা ও সরকারি চাকরি প্রদান করেন। তাদের মধ্যে একজন বিশেষ নারী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু একদিন বাসায় ফিরে দেখেন, একজন নারী বসে আছে শেখ হাসিনার বয়সি। ফজিলাতুন নেছা মুজিব জানান, মেজর জিয়ার স্ত্রী, জিয়া তাকে ঘরে নিচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু ফোনে জিয়াকে রাতে তাঁর সঙ্গে ভাত খেতে বলেন। মেজর জিয়া প্রেসিডেন্টের দাওয়াতে ভয়ে ভয়েই এসে অপেক্ষা করেন। খাবার টেবিলে ডাকলে আসেন। গিয়ে দেখেন খালেদা ও হাসিনাকে নিয়ে খেতে বসেছেন বঙ্গবন্ধু, তাকেও খাবার দেওয়া হলো। বঙ্গবন্ধু বলেন, হাসিনা আমার এক মেয়ে আর খালেদা আমার আরেক মেয়ে। তাকে নিয়ে বাসায় যাও আমি আর কিছু শুনতে চাই না। শুরু হলো খালেদার নতুন জীবন। তার পরের ইতিহাস সবার জানা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনও একা ভাত খেতেন না। বাসায় ভালো কিছু রান্না হলে, তিনি নিচে নেমে সিকিউরিটি গার্ডকে নিয়ে উপরে যেতেন। আর বলতেন, কামালের মা আজ মুরগির ঝোল রানছে আয় একলগে খাবো। সেই মেঠো ভাষা। তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন কর্তব্যরত কর্মচারীদের, সর্বোপরি তাঁর দলীয় কর্মীদের, ভালোবাসতেন দেশের আপামর জনগণকে।

ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে এক শীতের সকালে একজন কৃষক আসেন এক ঝাকা সবজি নিয়ে। ঝাকাটি নিয়ে দোতলায় চলে যায় এবং বঙ্গবন্ধুকে জানায় একজন কৃষক সবজি নিয়ে

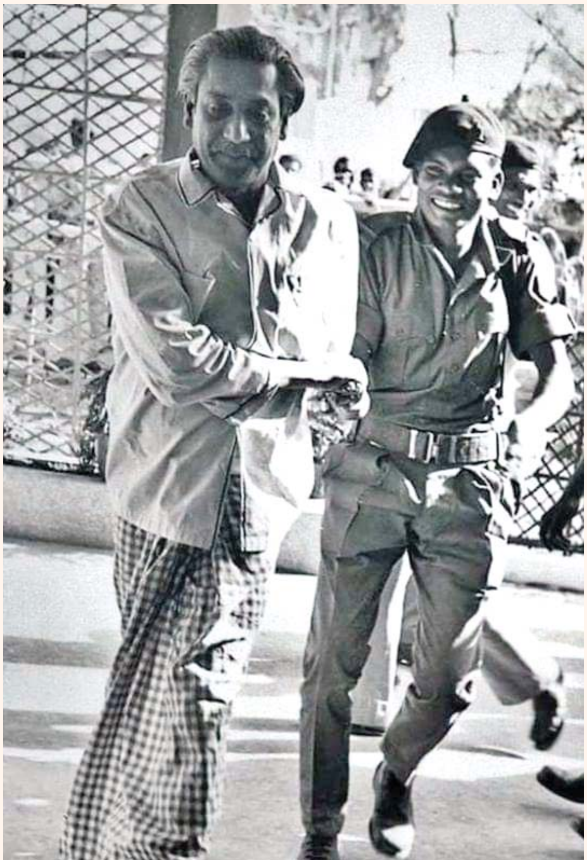

এসেছে, বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত ফোনে কথা বলছিলেন, তবুও একশ টাকা কাজের ছেলের হাতে দিয়ে দেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবে এইটুকু সবজির জন্য পঞ্চাশ টাকাই যথেষ্ট। তার হাতে পঞ্চাশ টাকা দিতেই দৌড়ে দোতলায় উঠে যায় সেই কৃষক। সে বলে, আমি আমার ক্ষেতের সবজি আনছি টাকা নিবো না। পঞ্চাশ টাকা ফিরিয়ে দেয়। সেদিন বঙ্গবন্ধু ভাবেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে ১০০ টাকা ৫০ টাকা হয়ে যায়, তাহলে দেশের উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব। ছোটো ঘটনা তার চোখ খুলে দেয়।

অবিভক্ত ভারতের কারাগারে কয়েদি দিয়ে ঘানি টানানো হতো। কোনো প্রতিবাদী কয়েদি হলে তাকে দিয়ে ঘানি টানানো হয়। এটা ব্রিটিশ কালচার কিন্তু ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলে। কী অমানবিক! গরুর বদলে মানুষ দিয়ে ঘানি টানানো। নির্দিষ্ট পরিমাণ সর্ষে থেকে তেল করতে হতো। আস্তে হাঁটলে পিঠে বেত পড়ত।

১৯৫১ সালে বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর জেলে গিয়ে দেখতে পান মানুষ দিয়ে ঘানি টানানো হচ্ছে, তাৎক্ষণিক বঙ্গবন্ধু জেলারকে ডেকে বলেন, সরকার যেখানে মানুষ দিয়ে ঘানি টানানো নিষিদ্ধ করেছে, আপনি চালু রেখেছেন কেন? তখন জেলার বলেন, গরু কেনা হচ্ছে, দুদিনের মধ্যে চলে আসবে। তখন বন্ধ করে দেওয়া হবে। সত্যি, জেলার তার কথা রেখেছিলেন। তারপরই মানুষ দিয়ে ঘানি টানা বন্ধ হয়ে যায় বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর জেলে থাকা অবস্থায়ই। যে কয়েদি ঘানি টানছিল সে অনেক দোয়া করেন বঙ্গবন্ধুকে। ঘানি টানলে স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, যা আর কখনো সুস্থ হয় না।

যারা জেলে না থেকেছে তারা জেলের খাবার সম্পর্কে বা জেলজীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারবে না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা *কারাগারের রোজনামচা* না পড়লে আমারও সেই ধারণা হতো না। খুবই নিম্নমানের, আর একঘেঁয়ে খাবার দেওয়া হয় জেলে। তাই বঙ্গবন্ধু জেলে থাকা অবস্থায় খাবার সঞ্চয় করে রাখতেন, জেলের বরাদ্দ থেকে। তাঁর জন্য রান্না হতো তা-ই, যা বাড়ি থেকে আসতো। চাল, ডাল, ঘি, অন্যান্য শুকনো খাবার দিয়ে যেতেন বেগম মুজিব। সেসব খাবার বঙ্গবন্ধু একা খেতেন না, তাঁর সঙ্গে থাকা বন্দি, জেলের কর্মচারী সবাইকে নিয়ে খেতেন। প্রায়ই খিচুরি, মুরগি, মাংস, মাছ বিশেষ খাবার নিজে তদারকি করে রান্না করিয়ে সবাইকে নিয়ে খেতেন।

১৯৭৪ সাল। সদ্য স্বাধীন দেশ দেখতে এসেছিলেন যুগোস্লাভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মার্শাল

টিটো। তখন যে-কোনো রাষ্ট্রপ্রধান আসা-যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুই দেশের পতাকা নেড়ে অভিবাদন জানাত। টিচাররা সুন্দর করে লাইন করে নিয়ে যেতেন। আমি তখন তেজগাঁও গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে পড়ি। যেদিন প্রেসিডেন্ট টিটো দেশে ফিরে যান, সেদিন সকাল থেকে আমাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে রাখে দুই দেশের পতাকা হাতে, বেলা বাড়ে রোদ চওড়া হয়, বিদায়ী অতিথি আসেন সাড়ে এগারোটা কী পৌনে বারোটার দিকে। আমাদের অবস্থা কাহিল তবু চিৎকার করে স্লোগান দেই অতিথি চলে যান। তেজগাঁও বিমানবন্দর দূরে নয়। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিবাদন জানাতে তখনো দাঁড়িয়ে। তিনি এলেন, তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। তিনি নেমে এলেন সিকিউরিটি ফোর্স এগিয়ে এল। তিনি বললেন, বাচ্চাদের এতক্ষণ কেন দাঁড় করিয়ে রাখা হলো? ভবিষ্যতে যেন এমন না হয়, ভালো টিফিন দিতে বললেন। পরদিন স্কুল ছুটি দেওয়া হলো। সামনে যে কজন ছিলাম আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেছিলেন। সেই হাতের স্পর্শ আমিও পেয়েছিলাম। এমন মানবিক মানুষ আর হবে কি?

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাঙ্গাইলের সন্তোষে যান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে। বঙ্গবন্ধু মওলানা ভাসানীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করে গাড়িটি দূরে রেখে বেশ খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে তাঁর বাড়ি যান। বিষয়টি দূরদর্শী নেতার চোখ এড়ায় না। দুপুরে পাটি পেতে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। কই মাছের ঝোল, করোল্লা ভাজি আর ডাল। নিজ হাতে পরিবেশন করছিলেন মওলানা ভাসানী। অপেক্ষাকৃত বড়ো কই মাছটি তিনি তাঁর খোকার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর পাতে তুলে দেন। খাওয়া শেষে যখন ফেরার সময় হলো বঙ্গবন্ধু বিদায় নিয়ে হাঁটছেন। সঙ্গে মওলানা ভাসানীও হাঁটছেন। বঙ্গবন্ধু যতই বলছেন হুজুর আপনি আর কষ্ট করে আসবেন না, অনেক রোদ। তিনি বলেন, আমি খোকাকে নয় আমি আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এগিয়ে দিচ্ছি। এরপর আর কী বলা যায়। যেমন নেতা তেমনি তাঁর শিষ্য।

সময়টা পঞ্চাশের দশক। বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি, শুধু কারাবন্দি নন অসুস্থ কারাবন্দি। অবস্থার অবনতি ঘটলে ভয় পেয়ে যায় কারা কর্তৃপক্ষ। তাৎক্ষণিক তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। কেবিনের বাইরে দুজন সিপাহি পাহারায়। তখন হালিমা নামের এক শিশুরোগী ভর্তি ছিল, তার চাচা পুলিশের বড়ো অফিসার ছিলেন। তিনি হালিমাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কেবিনে যান দেখা করতে। তারপর থেকে হালিমা রোজ যেতেন। চাচা সিপাহিদের বলে দিয়েছিলেন তাকে যেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে দেয়। শুধু তাই নয় ছোটো বলে তাকে চেক করা হতো না। জামার নিচে গুজে খবরের কাগজ নিয়ে যেতেন। এইভাবে হালিমা দূতের কাজ করতেন। বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে গল্প করতেন, ফল খাওয়াতেন, কমলা খেতে না চাইলে তাকে কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে তার ওপর নুন, চিনি লাগিয়ে দিয়ে খেতে দেন। হালিমা কমলা খাওয়ার মজা পেয়ে যায়, যত দিন হাসপাতালে ছিল, বঙ্গবন্ধু তাকে নিজ হাতে কমলা খাওয়াতেন। পরবর্তীতে হালিমা স্কুল শিক্ষক হন। তিনি স্মৃতিচারণে লেখেন– বঙ্গবন্ধুর শেখানো কমলা খাওয়ার মজার পদ্ধতি আজও বিদ্যমান। আমি বাচ্চাদের খাইয়েছি, এখন নাতি-নাতনিদের খাওয়াই আর বঙ্গবন্ধুর গল্প শোনাই।

সময়টা ১৯৭৩ সাল। চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত *সংগ্রাম* ছবিতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও নেপথ্য গল্প। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *সংগ্রাম* ছবির শুটিং চলছিল। সিনেমার শেষ দৃশ্যের চিত্রনাট্যে ছিল, মুক্তিযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন দেশের সামরিকবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্যালুট করছে। এই দৃশ্য কীভাবে ধারণ করা যায় তা নিয়ে চিন্তায় পড়লেন ছবির পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম। স্বাধীনতার আগে খসরু ছিলেন ছাত্রলীগের সক্রিয়কর্মী। বীরত্বের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে এরপর তিনি চলচ্চিত্রে আসেন। বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি। সেই স্নেহের সম্পর্কের সুবাদেই সিনেমার শেষ দৃশ্যের একটা ব্যবস্থা করার জন্য পরিচালক চাষী নজরুল ইসলামকে নিয়ে নায়ক খসরু সোজা গিয়ে হাজির হলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। সেই মুহূর্তের কথোপকথন চাষী নজরুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন এভাবে–

খসরু: আপনার কাছে একটা কাজে আইছি।

বঙ্গবন্ধু: কী কাজ?

খসরু: আমরা আর্মির মার্চ পাস্টের একটা দৃশ্য করব। আপনি স্যালুট নিবেন।

বঙ্গবন্ধু: চুপ, আমি ফিল্মে অ্যাক্টিং করব না। (ধমকের সুরে)

খসরু: এটা তো অ্যাক্টিং হইলো না।

বঙ্গবন্ধু: অ্যাক্টিং হইলো না কী? যা এখান থেকে। (আবারও ধমকের সুরে)

খসরু: না, আপনাকে করতেই হবে। আপনি না হলে সিনেমাটা শেষ করতে পারবো না।

বঙ্গবন্ধু: মান্নানরে ডাক দেখি। (তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান)

(স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান এসে খসরু ও চাষী নজরুলকে নিজের রুমে নিয়ে গেলেন।)

খসরু: বঙ্গবন্ধুরে অ্যাক্টিং করতে হইব।

আবদুল মান্নান: বঙ্গবন্ধু অ্যাক্টিং করব– এও সম্ভব?

খসরু: সম্ভব না হইলে কিন্তু আপনারে অ্যাক্টিং-এ দাঁড় করাইয়া দিমু। আপনি বঙ্গবন্ধুরে উলটাপালটা কিছু বইলেন না। শুধু বলবেন, অ্যাক্টিং করা যায়। (সবাইকে নিয়ে মন্ত্রী আবদুল মান্নান আবার ফিরে গেলেন বঙ্গবন্ধুর রুমে)

বঙ্গবন্ধু: কী তাইলে?

আবদুল মান্নান: ওই ঠিকই আছে। তয় করবেন কবে?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে বঙ্গবন্ধু রাজি হলেন কাজটি করে দিতে। খসরুকে বললেন, 'যা, করে দেব'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনের শেষ দিনে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট গুলির শব্দ শুনে নিচে নামছিলেন। সিঁড়ির কাছে ছেলেটি আহত হয়ে কাতরাচ্ছিল তিনি বলে উঠলেন, ওকে কে গুলি করল, ওকে হাসপাতালে নিতে হবে। কে কোথায়? এই কথা শেষ হতে না হতেই আসে সেই চরম মুহূর্ত। ঘাতকের বুলেটের বৃষ্টিতে গড়িয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে। আহত কাজের ছেলেটিকে ঘাতকদের একজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সে বেঁচে যায়। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী হয়েছিল সেই কাজের ছেলেটি।

সৈয়দা নাজমুন নাহার: সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও বেতারব্যক্তিত্ব

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

পঁচাত্তরের আগস্ট মাস। আঠারো বছরের কলেজপড়ুয়া এক তরুণ শহর থেকে গ্রামে এসেছে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে এসেই টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে সুদর্শন টগবগে অসীম সাহসী সেই ছেলেটি। নিভৃত পল্লির চৌচালা টিনের ঘরের উত্তরের কক্ষটিতে তখন দিনরাত তার শুধুই শুয়ে থাকা। সেসময় ডাক্তারি চিকিৎসার পাশাপাশি স্থানীয় কবিরাজ পেন্‌কা মুন্সির ঝাড়ফুঁকও চলছে। জ্বরের তাপে জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তার। কিছুই খেতে পারে না। ছিপছিপে পাতলা ছেলেটির শরীর কয়েকদিনের জ্বরে যেমন কাহিল হয়ে পড়েছে, তেমনি সোনাবরণ দেহের রংটাও খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। শরীরটা তার এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে বিছানা ছেড়ে উঠে ঠিকমতো বসতেও পারছে না। মা তরল খাবার এনে দু'একবার চামচ দিয়ে খাইয়ে দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করেন।

পাড়ায় আর কারও রেডিও না থাকায় আশপাশের বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা দেশ-বিদেশের খবর শোনার জন্য এ বাড়িতেই আসতেন। এখানে মুরুব্বিদের জন্য বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও বাংলাদেশ বেতারের খবর শোনার পাশাপাশি চায়ের সাথে পান-সুপারির ব্যবস্থাও থাকত।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। আনুমানিক সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা বাজে। বাড়ির মুরুব্বিরা পরস্পরে বলাবলি করছেন, আহা কী সর্বনাশ হয়ে গেলো! গতরাতে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে শেখ সাহেবকে আর্মির লোকেরা মেরে ফেলেছে! বিপথামী পাষণ্ডরা তাঁর পরিবার-পরিজনসহ বাড়ির চাকর-বাকরকেও জীবিত রাখে নাই। এখন দেশের অবস্থা যে কী হবে একমাত্র আল্লাহ মালিকই জানে।

ছেলেটি মুরুব্বিদের মুখের কথায় যেন সংবিৎ ফিরে পেল। বিছানা থেকে উঠে দুর্বল শরীরে আস্তে আস্তে তার পিতার কাছে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলে উঠল– 'না! বঙ্গবন্ধুকে কেউ মারতে পারে না'। মা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসে ছেলেটিকে জাপটে ধরে বললেন, বাবা, শান্ত হ। তোর শরীর খুব দুর্বল। মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যাবি তো। চল, তোকে বিছানায় শুইয়ে দিই। ছেলেটি ওর মাকে বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, মা, তুমি কি শুনেছ ? ওরা বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলেছে। মায়ের ধারণা, ছেলে বুঝি প্রলাপ বকছে। কিন্তু মুরুব্বিরা যখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার সংবাদ নিয়ে বলাবলি করছেন তখন তিনি থমকে গেলেন। আর ঠিক এ সময়ই রেডিওতে আবারও ঘোষিত হলো, শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত। মা তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের অগণিত কৃষক, শ্রমিক, মজুর, পুলিশ, ইপিআর, সেনাসদস্য, ছাত্রযুবক মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গপালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কত মুক্তিযোদ্ধা এই বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেছেন তার ইয়ত্তা নেই। চিড়া-মুড়ি-গুড় দিয়ে তাঁদের কতবারই না আপ্যায়ন করেছেন, এমনকি কোনো কোনো দিন তিনি নিজ হাতে রান্না করে তাঁদের খাইয়েছেন। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের কেউ মারতে পারে– এটা তিনিও বিশ্বাস করতে পারছেন না!

প্রকৃতি চুপচাপ, একেবারে নিশ্চুপ! পাখিদের কোনো কলরব নেই। রাখাল আজ গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়নি। কৃষক হাল নিয়ে জমিতে চাষ দিতে যায়নি। দিনমজুর ও কলকারখানার শ্রমিকেরা বাড়ির বাইরে বেরোয়নি। বাড়ির আঙিনায় হাঁস-মুরগিরও আনাগোনা নেই। গাঁয়ের কোথাও ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড়, সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। রাস্তাঘাটে কোনো পথচারীও চোখে পড়েনি। ঘন নীল আকাশটাও আজ মনমরা! সূর্যটা কেমন যেন ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে! নিষ্প্রাণ পৃথিবী! চারদিকে থমথমে পরিবেশ! শোকাহত মৃদুমন্দ বাতাস যেন ঘোষণা করে চলেছে– 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত'!

ছেলেটি তার মাকে বলল, মা আমি আজই শহরে চলে যাব।

– পাগল ছেলে বলে কী! ১০৩ ডিগ্রি জ্বরের তাপে থর থর করে শরীর কাঁপছে, এই দুর্বল শরীর নিয়ে তুই শহরে যাবি? মায়ের প্রশ্ন।

– হ্যাঁ মা, আমি শহরে যাব। আমি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করব। এ খুনের প্রতিশোধ নেব। আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত অবশিষ্ট

থাকতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বদলা আমাকে নিতেই হবে।

ছেলেটির পিতা বললেন, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? শরীরের এই অবস্থা নিয়ে তুমি শহরে যাবে? প্রতিবাদ করার অনেক সময় আছে। আগে সুস্থ হও। সুস্থ হয়ে তারপর যেখানে যাওয়ার যেও, যত পারো প্রতিবাদ করো। কষ্ট কি শুধু তোমার একার হচ্ছে। দুঃসংবাদটা শোনার পর থেকে আমারও তো শরীরটা অবশ হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্য দুঃখে আমারও তো বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

মা বললেন– মাথা ঠান্ডা করে বস, বাবা। জ্বরে তোর গা-টা পুড়ে যাচ্ছে, গামছা ভিজিয়ে শরীরটা মুছে দিই, আরাম পাবি।

ছেলেটি প্রত্যুত্তরে বলে– না মা, আমার কোনো অসুখ-টসুখ নেই। আমি একদম সুস্থ হয়ে গেছি। জলদি করে আমাকে এক টুকরো কাগজ ও একটা কলম দাও। মা ছেলেটিকে ধরে মেঝেতে পাতা টেবিলের সামনে রাখা একটি চেয়ারে বসিয়ে তাক থেকে কাগজ আর কলম বের করে হাতে দিলেন। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ এক নিশ্বাসে একটি কবিতা লিখে তার মাকে দেখালো। কবিতাটি পড়ে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর নির্বাক হয়ে তার চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছতে থাকলেন!

সেদিনের প্রথম প্রহরে সেই ছেলেটির লেখা 'অঙ্গীকার' শিরোনামের কবিতাটি ছিল এ রকম–

আমার চন্দ্রকে ওরা হত্যা করেছে
হত্যা করেছে অনেক তারার একটি আকাশ!
আমার সূর্যকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে
গ্রেপ্তার করেছে রক্তরাঙা একটি ইতিহাস!
সদা জাগ্রত ঐ স্বৈর-প্রাচীর আমি ডিঙাবো
আমি হাইড্রোজেন হবো
আমি ভিসুভিয়াস হবো
আমাদের নাড়ির ঠিকানায় আমরা পৌঁছবো
পৌঁছবো অবশ্যই পৌঁছবো।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনাটি তরুণ ছেলেটির মনে দিবারাত্র শুধুই ঘুরপাক খাচ্ছিল। কোনোভাবেই সে বিষয়টি মেনে নিতে পারছিল না। তার ভেতরে এক ধরনের তীব্রতা-ক্ষিপ্ততা কাজ করছিল। বঙ্গবন্ধুর জন্য তার হৃদয়নিংড়ানো অপরিসীম শ্রদ্ধা, দরদ ও মায়া-মমতা নিয়ে সেদিনই ছেলেটি আরও একটি কবিতা লিখল। 'উদ্বাহু সৈনিক' শিরোনামে সেদিনের লেখা দ্বিতীয় কবিতাটি ছিল এ রকম–

জীবন যুদ্ধে আমি এক উদ্বাহু সৈনিক
অনন্য ত্যাগের নির্যাস নির্ঘণ্ট প্রতীক
মরু-মরীচিকা বিজয়ে আরাধ্য পথিক
আলেয়া নিহত যোদ্ধার ঠিকানা সঠিক।
তুমি কি দেখ না অথচ আমি ঠিক দেখি
আঁধারে আলো রাশি রাশি নির্জনে একাকী।

কবিতা দুটোর রচয়িতা সেদিনের সেই ছেলেটি হলেন আজকের 'কবি সংঘ বাংলাদেশ'-এর সভাপতি, বিগত শতাব্দীর আশির দশকে সাড়া জাগানো 'জিল বাংলা সাহিত্য পুরস্কার' প্রাপ্ত এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি, সাংবাদিক ও কলামিস্ট তালাত মাহমুদ।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দিনটি কেমন ছিল! সেদিন কি কোনো গ্রহণ লেগেছিল? বাঙালি জাতি সেদিন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন? সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হলেন, আর গোটা জাতি নীরব-নিশ্চুপ থাকল। অথচ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত একজন তরুণ কবি সেদিন দুটি বিখ্যাত কবিতা লিখে বঙ্গবন্ধুর প্রতি হৃদয়নিংড়ানো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ব্যক্ত করলেন। এখন তো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে হাজার হাজার কবিতা লেখা হচ্ছে। কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হওয়ার ঘটনায় মর্মাহত হয়ে সেসময়ের টগবগে তরুণ কবি তালাত মাহমুদ ছাড়া আর কোনো কবি সেদিন তৎক্ষণাৎ বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে কোনো কবিতা লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।

কবি তালাত মাহমুদ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার নকলা থানার রাণীশিমুল গ্রামে মাতুতালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস একই থানার চন্দ্রকোণার বাছুর আলগা গ্রামের সরকার বাড়িতে। তাঁর পিতার নাম মো. মনিরুজ্জামান ও মাতার নাম হাসনা বানু। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। তিনি বিলুপ্ত *সাপ্তাহিক জনকণ্ঠে*র প্রধান সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বর্তমানে *দৈনিক ঢাকা রিপোর্ট*-এ প্রধান সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *স্বর্গের দ্বারে মর্তের চিঠি* ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৯৭৯ সালে *গীতিলতিকা* ও ২০০৪ সালে *লোকহীন লোকারণ্য* নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২০০৬ সালে *শিক্ষাভাবনা তৃণমূল হতে* নামক একটি গবেষণাগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত লিখেন। তাঁর যন্ত্রস্থ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *অদৃশ্যে দৃশ্যমান* (কাব্যগ্রন্থ), *উদাম গতরী ন্যাংটা বয়ান* (প্রবন্ধ) ও *শতাব্দীর শুরুতে বিপন্ন বিশ্ব* (প্রবন্ধ)।

কবি তালাত মাহমুদ তার 'অঙ্গীকার' ও 'উদ্বাহু সৈনিক' কবিতা দুটিতে উপমা উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ এবং প্রতিকায়িত শব্দের ব্যবহারে বিষয়বস্তুকে বিশালত্ব দান করেছেন। 'আমার চন্দ্রকে ওরা হত্যা করেছে/হত্যা করেছে অনেক তারার একটি আকাশ'! এখানে কবি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করার কথা অত্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে বিবৃত করেছেন। 'চন্দ্র' বলতে তিনি বঙ্গবন্ধুর কথা বুঝিয়েছেন। আবার 'অনেক তারার একটি আকাশ' বলতেও কবি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়েছেন। 'আমার সূর্যকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে/গ্রেপ্তার করেছে রক্তরাঙা একটি ইতিহাস'– এ দুটো বাক্যে তিনি স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র আর ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বর্গীদের দলিত-মথিত করার কথা বলেছেন; দেশ জাতি স্বাধীনতা বিপন্নের কথা বলেছেন।

তারপর শত বাধাবিপত্তিকে দলিত-মথিত করে বাঙালি জাতির নাড়ির ঠিকানায় পৌঁছার দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এভাবে– 'সদা জাগ্রত ওই স্বৈর-প্রাচীর আমি ডিঙ্গাবো/আমি হাইড্রোজেন হবো/আমি ভিসুভিয়াস হবো/আমাদের নাড়ির ঠিকানায় আমরা পৌঁছবো/পৌঁছবো অবশ্যই পৌঁছবো।'

'উদ্বাহু সৈনিক' কবিতায় কবি দেশমাতৃকার সেবায় এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ইস্পাতকঠিন শপথ গ্রহণের কথা জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। একজন সৈনিক যেমন ত্যাগের মহিমায় নিজেকে উৎসর্গ করে তেমনি তার শহিদি আত্মার ঠিকানাকেও সে সঠিক বলে মনে করে। শত প্রতিকূলতাকে জয় করার অভিপ্রায়ে

ব্যতিক্রমী আয়োজনে কবি এখানে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। নেতৃত্বহীন শূন্যতার মাঝে জাতিকে হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দৃঢ় মনোবলে ত্যাগ ও মহিমার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক স্বকীয়তায় বীরত্ব প্রকাশ করতে হবে। তাই কবি বলেছেন, 'তুমি কি দেখ না অথচ আমি ঠিক দেখি/ আঁধারে আলো রাশি রাশি নির্জনে একাকী।

মূলত বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে কবির মন হতাশার চোরাবালিতে যেভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সেখান থেকে উঠে আসার আত্যন্তিক প্রয়াসে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে অন্ধকারে লুকায়িত আলোর স্ফুরণ ঘটাতে চেয়েছেন। রাশি রাশি আলোর মিছিলে জাতি আবার জেগে উঠবে– কবি তালাত মাহমুদ জাতিকে এমন স্বপ্ন দেখতে আর আশা পোষণের কথাই তার কবিতায় দৃঢ়চিত্তে ব্যক্ত করেছেন।

জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু যে লক্ষ-কোটিগুণ বেশি শক্তিশালী– পরবর্তীতে জেনে গেছে বিশ্ববাসী, জেনে গেছে হায়েনা খুনিচক্র। ঘৃণ্য দুর্বৃত্তচক্রটি কাপুরুষোচিতভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে চেয়েছিল, স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে চেয়েছিল, বাঙালি জাতির পায়ে আবারও গোলামির শিকল পরাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালি যে বীরের জাতি– দুর্বৃত্তদের তা বুঝতে বিলম্ব হয়েছিল। আমরা জাতির পিতাকে হারিয়েছি, তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হারিয়েছি! এই হারানোর মাঝেও আমরা বঙ্গবন্ধুর ইস্পাতকঠিন দৃঢ় মনোবল, তাঁর চিন্তাধারা আর বজ্রকঠিন ভাষণের মাঝে আমাদের সমস্ত জাতিসত্তার অনাবিল উদ্যম ও প্রগাঢ় ভিত্তিমূল আজও খুঁজে পাই। পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এও অনুধাবন করি, জাতির প্রতি তাঁর যে প্রগাঢ় মমত্ববোধ ছিল, যে অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল– শেষে তা তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন।

পৃথিবীর অনেক দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক ও অবিসংবাদিত জননেতা আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন; তাঁদের মাঝে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি, পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৮১ সালের ৬ই অক্টোবর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর, ভারতের আরেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৯১ সালের ২১শে মে, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসা ১৯৯৩ সালের ১লা মে, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব ২০০১ সালের ১লা জুন নিহত হন।

এসব নন্দিত জননেতা ও রাষ্ট্রনায়ক আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের দেশীয় বা বিদেশি কোনো কবির লেখনী থেকে এ রকম কোনো শোকগাথা প্রকাশ পায়নি; যেমনটি আমরা দেখতে পাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হওয়ার বেদনায় কাতর কোনো কবির কবিতায়। আর সেই আত্মপ্রত্যয়ী কবিই হলেন 'সাবমোচন' খ্যাত কবি তালাত মাহমুদ।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবার নিহত হওয়ার পর থেকে এযাবৎকালে তাঁকে নিয়ে হাজার হাজার কবিতা লেখা হয়েছে। অল্প সংখ্যক কবির কবিতা পাঠক সমক্ষে এলেও অনেক নামিদামি কবির কবিতা তিমিরেই রয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কত সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে তারও সঠিক হিসাব কষা দুষ্কর। তবে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হওয়ায় শোকে মুহ্যমান এসব করুণগাথা তাবৎ বিশ্ববাসীকে অনাদিকাল ধরে ব্যথিত করবে।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর

১৭ জেলার ২৪৭৬১ বীর মুক্তিযোদ্ধা পাচ্ছেন স্মার্ট আইডি কার্ড

প্রাথমিকভাবে ১৭ জেলার মোট ২৪ হাজার ৭৬১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা পাচ্ছেন স্মার্ট আইডি কার্ড। এছাড়াও ৪৬ হাজার ৮০৩ জন পাচ্ছেন ডিজিটাল সার্টিফিকেট। ২৮শে জুলাই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী জানান, ইতোমধ্যে ১৭টি জেলার ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড প্রিন্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে– কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, নড়াইল, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ঢাকা, শরীয়তপুর, মেহেরপুর ও নারায়ণগঞ্জ। বাকি ৪৭টি জেলার ডিজিটাল সার্টিফিকেট এবং স্মার্ট আইডি কার্ডের প্রিন্টিং কাজ দেড় মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, প্রথম দফার ৪৬ হাজার ৮০৩ জন ডিজিটাল সার্টিফিকেটধারীর মধ্যে জীবিত ২৪ হাজার ৭৬১ এবং মৃত ২২ হাজার ৪২ জন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া বলেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বিতরণের এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহানগরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। জেলাভিত্তিক ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড সর্বশেষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে: www.molwa.gov.bd প্রকাশিত সমন্বিত তালিকা যাচাই করে বিতরণ করতে হবে। এসময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সাবেক নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাজাহান খান। অনুষ্ঠানে ১৭টি জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

প্রতিবেদন: বিজয় কুমার

শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব: সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক

শামস সাইদ

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, পারিবারিক জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব রেখেছেন অনন্য ভূমিকা। তিনি ইতিহাসের কোনো চরিত্র নন। ছিলেন না রাজনৈতিক কোনো পদে। ছিলেন না রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে। তবু তিনি ছিলেন সর্বত্র। ইতিহাস তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। পারবে না। কারণ, তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস কিংবা বঙ্গবন্ধুকে লিখতে গেলে বেগম মুজিবকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ফজিলাতুন নেছার জীবনে যেমন জড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু, তেমনি বঙ্গবন্ধুর জীবনেও জুড়ে আছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বেশ চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেই সময়ে বেগম মুজিবের ভূমিকা, বিচক্ষণতা, ত্যাগ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনে স্ত্রীকে শুধু সহধর্মিণী নয়, পেয়েছিলেন সহযোদ্ধা ও সহকর্মী হিসেবে। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধু হতে পেরেছিলেন তাঁর স্ত্রীর প্রণোদনায়; অবশ্য স্বীকার্য যে, এতে তাঁর নিজস্ব মেধা-মনন ও উদ্যম-উদ্যোগও ছিল। তবে দুজনের মধ্যে ব্যাপারটি ছিল অন্য, একজন মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে একটি জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টায় ছুটেছিলেন, চাচ্ছিলেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে। অন্যজন সেই মশালে জ্বালানি সরবরাহ করেছেন। এখানে এসেই তাঁরা একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে উঠলেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোশহীন নেতা। বজ্রকঠিন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। সেই বজ্রের চৌদ্দ আনা বারুদ ছিলেন বেগম মুজিব। তাঁর সমর্থন, সাহায্য ও একাত্মতা ছাড়া বঙ্গবন্ধু কতটা আপোশহীন নেতা হতে পারতেন? বঙ্গবন্ধু হতে পারতেন? সে প্রশ্ন তৈরি হবে বেগম মুজিবের জীবনী পাঠ করলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। সাহস, শক্তি এবং সকল দুঃখ ও নির্যাতন বরণের ধৈর্য ও প্রেরণা জুগিয়েছেন মহীয়সী এই নারী। যদি বেগম মুজিব আত্মসর্বস্ব হতেন, সংসারসর্বস্ব হতেন, ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব হতো না বছরের পর বছর কারাগারে থাকা।

বঙ্গবন্ধু জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। মুক্ত হয়েও যে পরিবারের কাছে ফিরেছেন এমন নয়। তখন পুরো দেশ হয়ে উঠেছিল তাঁর পরিবার। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ছিল সেই পরিবারের সদস্য। তাই বেরিয়ে পড়তেন মানুষের মুক্তির সংগ্রামে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আবার ছুটতেন পশ্চিম পাকিস্তানে। কোনো সময়ই তাঁর মাথায় স্ত্রী-সন্তানের চিন্তা ছিল না। সে চিন্তা থেকে মুক্ত করেছিলেন বেগম মুজিব। কখনও অভিযোগ তো করেননি, উলটো সাহস জুগিয়েছেন। অর্থ দিয়েছেন। যদি এর উলটো হতো, তাহলে স্ত্রী-সন্তানের সুখের কথা চিন্তা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসী পথে যাত্রা না করে বঙ্গবন্ধু সংসারমুখী হতে বাধ্য হতেন। সংগ্রাম রেখে হাল ধরতে হতো সংসারের। তাহলে স্বাধীনতা স্বপ্নই রয়ে যেত বাঙালির মননে ও বাংলার আকাশে।

বেগম মুজিবের সেই ত্যাগের কথা, সংগ্রামের কথা বাঙালির অজানা নয়। বঙ্গবন্ধু যেন দুর্গের মতো বাড়ি, সেই দুর্গের কর্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা। স্বামীর চাইতেও কঠিন ও অনমনীয় ছিলেন তিনি। জীবনে অসহ্য দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করেছেন। কিন্তু স্বামীকে প্রলোভনের কাছে মাথা বিক্রি করতে দেননি। ক্ষমতা কিংবা অর্থের মোহে কখনও আপোশ করতে দেননি।

মুজিব-রেণুর দাম্পত্যজীবন ব্যতিক্রমী। পারিবারিক কারণে বাল্যবিয়ে হয়েছিল তাঁদের। সেকথা বঙ্গবন্ধুও লিখেছেন:

> আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার তের [১৯৩২/৩৩] হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড়ো ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।'... আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম ছিল বন্ধুর পথে বিচরণের; বাড়ি ছিল তাঁর জন্য স্বল্পদিনের মুসাফিরখানা; কারাগারে কেটেছে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তাহলে বঙ্গবন্ধুর পরিবার চলত কীভাবে? কে এতসব সামলাতো? আমাদের অনেকের জানা নেই বত্রিশ নম্বর বাড়ির ইতিহাস। ইট বহন করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দেখভাল করেছেন বঙ্গবন্ধুর রেণু। বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে না হয় দেশ-মানুষলগ্ন। বাড়িলগ্ন হতে পারেননি। সংসার সামলানো, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া আবার কখনও দল সামলানো, দলের নেতাকর্মীদের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো। সবটাই হাসিমুখে করেছেন বেগম মুজিব।

বঙ্গমাতা নিজেই বলেছেন সেসব কথা, কীভাবে ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করেছেন, 'আমি চুবানি খাইয়া খাইয়া সাঁতার শিখছি, বাচ্চাদের এতটুকু বিলাসিতা শিখাই নাই।' তাঁকে কখনও সুসজ্জিতা দেখা যায়নি; গ্রামের সাধারণ নারীর মতো ছিল তাঁর চলাফেরা। ছেলেমেয়েদেরকেও কখনও বিলাসপ্রবণ মনে হয়নি।

কারাজীবন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দুশ্চিন্তা না থাকলেও বেগম মুজিব ভাবতেন সময়টা কাজে লাগুক। শুয়ে বসেই তো কাটাচ্ছে। নতুন

বই নিয়ে যেতেন। কখনও বঙ্গবন্ধু বলতেন নতুন বইয়ের কথা। সেসব নিয়ে হাজির হতেন তিনি। নিঃসঙ্গ জীবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ছিল বই। একদিন বেগম মুজিব চারটা খাতা নিয়ে গেলেন । যা দেখে রীতিমতো বঙ্গবন্ধু অবাক। এসব দিয়ে কী করবেন!

অসমাপ্ত আত্মজীবনী-এর শুরুতে বঙ্গবন্ধু তুলে ধরেছেন সেকথা, 'আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনি।' বঙ্গবন্ধুর লেখালেখির অনুপ্রেরণায় যে বেগম মুজিব সেটা আমরা দেখতে পাই। রাজনীতিবিদ-রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর পেছনে ষোলো আনা অবদান না থাকলেও লেখক বঙ্গবন্ধুর ষোলো আনা অবদান বেগম মুজিবের।

বেগম মুজিব রাজনীতি না করলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল তাঁর। শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'আন্দোলন কীভাবে করতে হবে, সেটা মায়ের কাছ থেকেই শেখা।' প্রকাশ্যে নয়, আড়ালের রাজনীতিবিদ ছিলেন বঙ্গমাতা। গেরিলার মতো যোদ্ধা, গেরিলা রাজনীতিবিদ। স্বামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থেকেও দেশে কী ঘটছে, জনগণ কী ভাবছে আর বলছে, তার খোঁজখবর রাখতেন। ৩২ নম্বরে খাটের ওপর বসে শুধু পান বানাতেন না। সারা দেশের রাজনীতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তিনি।

ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন নিয়ে বঙ্গবন্ধু দ্বিধান্বিত ছিলেন। বঙ্গমাতা পরামর্শ দিলেন, 'আমি বলেছি, বুড়াদের নিয়ে আপনি এত ঘাবড়ান কেন? আপনার রয়েছে হাজার হাজার তরুণ কর্মী, ছাত্র, যুবক। তারা আপনার ডাক শুনলে হাসিমুখে আন্দোলনে ঝাঁপ দেবে।'

উনসত্তরে যখন গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশ উত্তাল তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি বঙ্গবন্ধু প্যারোলে আইয়ুব খানের সঙ্গে আলোচনা করতে যাবেন, এমন একটি প্রস্তাব দেওয়া হলো। আওয়ামী নেতারাও রাজি। বঙ্গবন্ধু দ্বিধাগ্রস্ত। তা দূর করলেন বেগম মুজিব। শেখ হাসিনাকে দিয়ে বার্তা পাঠালেন, 'আপনি যদি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইয়ুবের গোলটেবিলে যান, তাহলে বত্রিশ নম্বরে আর ফিরবেন না। বেগম মুজিবের কথা রাখলেন বঙ্গবন্ধু। তারপরের ইতিহাস তো সবারই জানা।

৭ই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ। কিন্তু ভাষণের আগের সময় ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে কঠিনতম। সারা দেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে। আওয়ামী নেতারা একমত ছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণা করা সমীচীন হবে না; তবে পূর্বশর্ত ঘোষণা করে আন্দোলন চলমান রেখে ইয়াহিয়াকে চাপে রাখতে হবে। স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সামরিক জান্তা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার সুযোগ পাবে। আবার ছাত্রনেতাদের দাবি, স্বাধীনতা ঘোষণা করতেই হবে। মানসিক চাপের মধ্যে বঙ্গবন্ধু, দ্বিধা তো ছিলই। এই পরিস্থিতিতে কী বলতে হবে তা বলে দিলেন বেগম মুজিব। প্রশ্ন করলেন, আপনার মন কী চায়?

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই। বঙ্গমাতা বললেন, আপনার মন এবং বিবেক যা চায়, আজ তাই করুন। ভয়ে পিছিয়ে যাবেন না। তাঁর শেষ কথা ছিল, মনে রাখবেন, আপনার পেছনে বন্দুক, সামনে জনতা। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলেন দ্বিধা থেকে। ঠিক তাঁর মন যা বলতে চেয়েছে তাই বলেছিলেন সেদিন।

২৩শে মার্চ ঘিরেও বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের মতো উভয় সংকটে পড়েছিলেন; সেদিন ৩২ নম্বর বাড়িসহ সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উড়বে। আওয়ামী নেতারা ভিন্নমত পোষণ করলেন। তাদের কথা ছিল, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো মানে তাদের উসকানি দেওয়া, যা বঙ্গবন্ধুও করতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু ছাত্রনেতাদের চাপও সামলাতে পারছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গমাতা বললেন, 'আপনি ছাত্রনেতাদের বলুন, আপনার হাতে পতাকা তুলে দিতে। আপনি সেই পতাকা বত্রিশ নম্বরে ওড়ান। কথা উঠলে বলতে পারবেন, আপনি ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।'

স্বাধীনতা লাভের পরে রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু যখনই সংকটে পড়েছেন সেখানে পথের সন্ধান দিয়েছেন বেগম মুজিব। ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ বৈঠকে যাবেন কি না বঙ্গবন্ধু দ্বিধায় ছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, সম্মেলনে যেতে রাজি হন বঙ্গবন্ধু। এবার স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালেন বেগম মুজিব। তাঁর দ্বিমতের পক্ষে দুটো যুক্তি তুলে ধরলেন। বঙ্গবন্ধু লাহোরে গেলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ভুট্টোকে ফিরতি সফরের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। ভুট্টো ঢাকায় এসে বাংলাদেশবিরোধী পাকিস্তানপন্থিদের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ় করবে। পাকিস্তানে বাংলাদেশের দূতাবাস না থাকায় বঙ্গবন্ধুর দেখভাল করবে পাকিস্তান, যা বিপজ্জনক। এই সন্দেহ অমূলক ছিল না। ভুট্টো বাংলাদেশে এসে ঠিক সে কাজটিই করেছিলেন, যার কথা বঙ্গমাতা আগেই বলে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্য বেগম মুজিব ছিলেন শক্তিদায়িনী, প্রেরণাদায়িনী। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির বটবৃক্ষ; আর বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুর ছায়াবৃক্ষ। তাই বঙ্গমাতা বা বঙ্গবন্ধুর রেণুকে বাদ দিয়ে বাংলার ইতিহাস পূর্ণতা পেতে পারে না। ৮ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর রেণুর জন্মদিন। বাঙালির হৃদয়ে রয়েছে তাঁর স্থান।

শামস সাইদ: কথাসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধু হত্যায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র

মোহাম্মদ শাহজাহান

৪৭ বছর আগে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ভোররাতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারের সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭১ সালেই স্বাধীন বাংলাদেশের জনক হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের নেতায় পরিণত হন। এটা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্য যে, ১৫ই আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ড ছিল একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। যারা একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে, ঠিক তারাই পঁচাত্তরে স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছে। মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রে বিদেশি চক্রান্তকারীদের মধ্যে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জেড এ ভুট্টোর ভূমিকা ছিল একেবারে ন্যক্কারজনক। এই দুই চক্রান্তকারী সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ঠেকিয়ে রাখার কিসিঞ্জারের সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করে। ড. কিসিঞ্জারের প্রাক্তন স্টাফ অ্যাসিসটেন্ট রজার মরিস ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবের প্রতি ড. কিসিঞ্জারের তীব্র ঘৃণার কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে কিসিঞ্জার ও মার্কিন বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে ড. কিসিঞ্জারের একজন বিশ্বস্ত প্রবীণ সহকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন মরিস। উক্ত প্রবীণ সহকারী বলেন, "কিসিঞ্জারের আমলে মার্কিন বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনটি 'নেমেসেস' (প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) ছিল। এঁরা হলেন ড. কিসিঞ্জারের বিদেশি শত্রুর তালিকায় তিনজন 'সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি।' এই তিনজন হলেন চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে, ভিয়েতনামের থিউ এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিব। এঁরা কিসিঞ্জারের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।"

মরিসের মতে, 'অপর দুজনের তুলনায় শেখ মুজিব ভিন্ন পর্যায়ে পড়েন।' মরিস বলেছেন, '১৯৭১ সালে মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি চীনের সঙ্গে তাঁর (কিসিঞ্জারের) কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের পথে বাধাস্বরূপ, এমনকি ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। ভিয়েতনামের সঙ্গে আপোশ-আলোচনাসহ আরও বহু বিষয় চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল ছিল।' মরিস আরও বলেন, 'মুজিব ক্ষমতায় আসেন সবকিছু অগ্রাহ্য করে, আমেরিকা ও তার অনুগ্রহভাজন পাকিস্তানকে সত্যিকারভাবে পরাজিত করে এবং মুজিবের বিজয় ছিল আমেরিকার শাসকবর্গের পক্ষে অত্যন্ত বিব্রতকর। বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে কিসিঞ্জার তার ব্যক্তিগত পরাজয়ের শামিল ছিল বলে মনে করেন।'

মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রে দেশি-বিদেশি চক্রের বিশেষভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি দুই জন বিদেশি সাংবাদিকের লেখা গ্রন্থে বিশেষভাবে উঠে এসেছে। প্রথমটি হলো মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজের গ্রন্থ *বাংলাদেশ: দি আনফিনিশড রেভল্যুশন (Bangladesh: The Unfinished Revolution)* এবং দ্বিতীয়টি হলো মার্কিন সাংবাদিক স্ট্যানলী ওলপার্টের গ্রন্থ *জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান: হিজ লাইফ অ্যান্ড টাইমস (Zulfi Bhutto of Pakistan: His life and Times)*। লিফশুলজ তাঁর গ্রন্থে বহু তথ্য সমাবেশ করে প্রমাণ করেছেন মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-এর সঙ্গে মুজিব হত্যাকারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লিফশুলজ লিখেছেন, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে নিয়োজিত অফিসারগণ ১৫ই আগস্টের অন্তত ৬ মাস আগে থেকেই জানতো মুজিবের সরকারকে উৎখাতের জন্য নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক উলপার্টের গ্রন্থে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে বাংলাদেশের মাওপন্থিদের সরাসরি যোগাযোগ এবং মুজিববিরোধী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও বেতারযন্ত্র সরবরাহ সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য দলিলের কথা উল্লেখ করা হয়। উলপার্ট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, দু'বছর যাবৎ ভুট্টো বাংলাদেশের কয়েকটি মুজিববিরোধী দলকে তাঁর গোপন 'স্বেচ্ছাধীন তহবিল' থেকে অর্থ সাহায্য অব্যাহত রাখেন। আগস্ট মাস (১৯৭৫) শেষ হওয়ার আগেই তিনি তাঁর বিনিয়োগের ফল লাভ করেন। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট এর জেনারেল সেক্রেটারি আবদুল হক 'গভীর বেদনা ও নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা' নিয়ে তাঁর প্রিয় প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর কাছে ১৯৭৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লিখিত এক চিঠিতে 'জনগণের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্যুত মুজিবের পুতুল সরকার'-এর বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য 'অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র এবং বেতারযন্ত্র' সরবরাহের আবেদন জানান। উক্ত 'সর্বোচ্চ গোপনীয় ও অত্যন্ত জরুরি' চিঠিখানি ১৯৭৫-এর ৬ই জানুয়ারি ভুট্টোর হাতে পৌঁছায়। ঢাকা থেকে লিখিত আবদুল হকের চিঠিখানি প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর বিশেষ উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর মর্যাদাভোগী মাহমুদ আলীর মাধ্যমে পাঠানো হয়। সরকারি নথিভুক্ত করে চিঠিখানি তিনি ভুট্টোর কাছে প্রেরণ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্য ড. হেনরি কিসিঞ্জার নানামুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এমনকি ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের আগেই নবসৃষ্ট দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বাজে মন্তব্য করেন। ১৯৭১-

এর ৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি ড. কিসিঞ্জার আলোচনার এক পর্যায়ে মন্তব্য করেন, নবগঠিত জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক 'বাস্কেট কেইস' (ভিক্ষুকের দেশ) হতে পারে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করার পর পরাজিত ও ব্যর্থ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কিসিঞ্জার বিজয়ের মহানায়ক শেখ মুজিবকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বঙ্গবন্ধু মুজিব ছিলেন বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্য কিসিঞ্জার চক্র বাংলাদেশের খাদ্য জাহাজ আটকে দিয়ে এবং নানামুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেন।

১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। ঐ দুর্ভিক্ষ ছিল মানবসৃষ্ট। অর্থাৎ আমেরিকার চক্রান্তে বিদেশি খাদ্যশস্য নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশে পৌঁছতে পারেনি। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমেরিকার 'কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনস' কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স'-এ মুদ্রিত এক গবেষণামূলক নিবন্ধে, এমা রথচাইল্ড বিভিন্ন সরকারি দলিলপত্র উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন– ১৯৭৪ সালের মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর জন্য মার্কিন সরকারই দায়ী। 'ফুড পলিটিক্স' শীর্ষক নিবন্ধে এমা রথচাইল্ড বলেন, ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বাণিজ্যিক বাজার থেকে আমেরিকান খাদ্যশস্য কিনে। ১৯৭৪ সালের শুরুতেই বাংলাদেশ সরকার আমদানি চাহিদা পূরণের জন্য কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্যশস্য ক্রয়ের চুক্তিসম্পাদন করে। তখনকার উচ্চ বাজার দরে কেনা খাদ্যশস্যের মূল্য স্বল্পকালীন বাণিজ্যিক ঋণ নিয়ে শোধ করার কথা। ১৯৭৪ সালের গরমকালে বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র অভাবজনিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। আমেরিকার খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো শরৎকালে বাংলাদেশে পৌঁছানোর জন্য স্থিতিকৃত দুটি বড়ো রকমের বিক্রি চুক্তি বাতিল করে। ইতোমধ্যে পিএল-৪৮০ কর্মসূচি অনুযায়ী বাংলাদেশকে খাদ্য সাহায্য দানের চুক্তি রূপায়ণও বিলম্বিত হয়। অজুহাত দেখানো হয় যে, কিউবার কাছে পাট বিক্রি করেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান লিখেছেন, '১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এক প্রকট দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে খাদ্য সাহায্যকে ব্যবহার করল। এই চাপ ছিল এমন একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন আনার জন্য, যার ফসল হলো ১৯৭৫ সালের হত্যাকাণ্ড। এসব কারণে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন খাদ্যশস্য বাংলাদেশে পৌঁছায়, তার আগেই শরৎকালীন দুর্ভিক্ষের অবসান হয়।'

এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৪ সালে শাড়ির পরিবর্তে মাছ ধরার জাল পরিহিতা এক মহিলার ছবি *দৈনিক ইত্তেফাকে* দুর্ভিক্ষের প্রতীক হিসেবে প্রকাশিত হয়। *ইত্তেফাক*-এর ফটো সাংবাদিক আফতাব আহমদ তার ক্যামেরায় উত্তরবঙ্গের চিলমারী থানার বাসন্তী নামে এক মহিলার ছবিটি গ্রহণ করে। ঐ ছবিটি ছিল সাজানো। বঙ্গবন্ধু সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই উক্ত ফটোসাংবাদিক আফতাব এবং রমনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনসার আলী সাজানো মিথ্যা ছবিটি প্রচার করে।

কথায় বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।' বঙ্গবন্ধু হত্যা-ষড়যন্ত্রে জড়িতদের নাম আবার ওঠে এসেছে মার্কিন অবমুক্ত করা দলিলে। সপরিবার বাঙালি জাতির পিতা হত্যাকাণ্ডে বিদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ভূমিকায় ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার ও পাকিস্তানের ভুট্টো। এসব দলিলে দেখা যায়, শেখ মুজিবকে হত্যার ব্যাপারে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কিসিঞ্জার। এমনকি ১৫ই আগস্ট ভোর রাতে কুলাঙ্গাররা যখন ৩২ নম্বর বাসভবনে হত্যা অভিযান চালায়– সেই মুহূর্তেও সুদূর আমেরিকা থেকে কিসিঞ্জার খোঁজখবর রাখছিলেন। মোশতাক-জিয়ার লেলিয়ে দেওয়া কয়েকজন কুলাঙ্গার বিপথগামী সেনা সদস্য ২টি ইউনিট নিয়ে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শুক্রবার ওয়াশিংটন সময় সকাল ৮টায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়ে স্টাফ সভায় বসেন। ঢাকার খবর জানার জন্য উদগ্রীব কিসিঞ্জার বৈঠকের শুরুতেই বলেন, 'আমরা এখন বাংলাদেশ প্রসঙ্গে কথা বলবো।' নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আথারটন সভায় বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে বলেন, 'এটা হচ্ছে সুপরিকল্পিত ও নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করা অভ্যুত্থান।' কিসিঞ্জার জানতে চান, 'মুজিবুর কি জীবিত না মৃত?' আথারটন বলেন, 'মুজিব মৃত। তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠসহ পরিবারের সদস্য, ভাই, ভাগ্নে নিহত হয়েছেন।' কিসিঞ্জার এই সভায় বসার আগেও ঐদিনের ঘটনাবলি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার বলেন, 'আমি ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ (আইএনআর) থেকে আরও ভালো খবর পেয়েছি।' তিনি ঐ কর্মকর্তার সঙ্গে ওয়াশিংটনে আগেই কথা বলেছেন। নরাধম কিসিঞ্জারের ভালো খবর হচ্ছে আমাদের জাতির পিতাকে হত্যার খবর।

ব্যুরো পরিচালক উইলিয়াম জি হিল্যান্ড কিসিঞ্জারকে জানান, 'আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, তখনো তিনি (শেখ মুজিব) নিহত হননি।' কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা? তারা কি কিছু সময় পর তাকে হত্যা করেছে?' এর জবাবে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আথারটন বলেন, 'আমরা যতদূর জানি– আমি বলতে পারি না যে, আমরা বিস্তারিত সবকিছু জেনে গেছি। কিন্তু ইঙ্গিত ছিল তাঁকে হত্যা-পরিকল্পনা বিষয়েই। তারা তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে। ভেতরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে হত্যা করে।' ওয়াশিংটন সময় সকাল আটটায় বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে স্টাফ সভায় মিলিত হওয়া এবং তারও আগে মুজিব হত্যা সম্পর্কে আথারটনের সাথে কিসিঞ্জারের তৎপরতা থেকে বুঝা গেল সে রাতে বড়ো মাপের ঐ কুলাঙ্গার শিরোমণি ঘুমাননি। কিসিঞ্জারের নীতি হলো কোনো স্থায়ী শত্রু বা মিত্র নয়, শুধু স্থায়ী হলো স্বার্থ। কিসিঞ্জারের চরিত্রে রয়েছে প্রচণ্ড প্রতিহিংসা-পরায়ণতা।' তিনি ভাবতেন 'মুজিব আমাদের লোক নন। আর তিনি যদি আমাদের লোক না হন, তবে স্থায়ী স্বার্থ বলে আমাদের কিছু থাকতে পারে না। বাংলাদেশের ঘটনাবলি তিনি ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবে নেন।' কিসিঞ্জার প্রথম ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। ১৯৭৩-এর শেষের দিকে তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

যতদূর জানা যায়, ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ইউজিন বোস্টার মুজিব হত্যা-ষড়যন্ত্রে খুবই সক্রিয় ছিলেন। আর বাংলাদেশে মোশতাক, জিয়া, ফারুক-রশীদ চক্র তাদের বিদেশি প্রভুদের ঘৃণ্য ভৃত্য হিসেবে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করেছে। বোস্টার গং ঢাকায় খুনি চক্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এমনকি ১৫ই আগস্ট ভোররাতে হত্যাযজ্ঞ চলাকালে ঢাকার রাজপথে বোস্টারকে তার গাড়িতে ঘুরতে দেখা গেছে। সোজা কথায়,

হাজার হাজার মাইলের পথ সুদূর ওয়াশিংটন থেকে কিসিঞ্জার এবং ঢাকা থেকে বোস্টার মুজিব হত্যাকাণ্ড সরাসরি তদারকি করেছেন। তারপর বোস্টার ঘন ঘন বার্তা পাঠিয়ে ঢাকার পরিস্থিতি ওয়াশিংটনকে অবহিত করেন। মার্কিন দূতাবাস তাদের বার্তায় ঘাতক চক্র কর্তৃক বাংলাদেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে হত্যার মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে উল্লেখ করে। যদিও ১৫ই আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না। ১৫ই আগস্ট এক বার্তায় বোস্টার ওয়াশিংটনকে জানায়, 'সকাল ১১টা পর্যন্ত অভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে, ঢাকা বা বাইরে কোথাও কোনো গোলযোগ হয়নি। তবুও আমরা কিছু প্রতিরোধের আশঙ্কা এখনই নাকচ করে দিচ্ছি না। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। বেতার মাধ্যমে সেনা, নৌ, বিমান, বিডিআর ও পুলিশ প্রধানরা সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে বিবৃতি প্রচার করেছেন।'

বোস্টার ঐদিন আরেকটি বার্তায় লিখেছে: 'ঢাকায় এখন বিকেল চারটা। তেমন কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই অভ্যুত্থান সফল। রাস্তাগুলো শান্ত, লোক চলাচল খুবই কম, যানবাহন নেই বললেই চলে, দু'ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল ছিল এবং রাস্তায় সেনা টহল রয়েছে।' ১৬ই আগস্ট বোস্টার আরেক বার্তায় খোন্দকার মোশতাককে আমেরিকাপন্থি হিসেবে উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে খুনি সর্দার কিসিঞ্জার ছাড়াও উল্লসিত হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জেড এ ভুট্টো। স্বাধীনতার দু'বছর পর বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোশতাকের অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘাতক সরকারকে সবার আগে স্বীকৃতি দেয় ভুট্টো। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় 'ইসলামিক রিপাবলিক বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তৃতীয় বিশ্ব এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। খুশিতে ডগমগ ভুট্টো ১৫ই আগস্ট আরও ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তান শীঘ্রই বাংলাদেশে ৫০ হাজার টন চাউল, ১ কোটি গজ মোটা কাপড় এবং ৫০ লাখ গজ মিহি কাপড় উপহার হিসেবে প্রেরণ করবে।' ভুট্টোর আগে ঘাতক মেজর ডালিম ১৫ই আগস্ট সকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' হিসেবে প্রচার করে। মার্কিন অবমুক্ত দলিলে বলা হয়, 'মুজিব হত্যার পর ভুট্টোর উত্তেজনা এতটাই তীব্র হয়েছিল যে, তিনি বাংলাদেশের নাম পালটে ইসলামি প্রজাতন্ত্র রাখেন এবং শিশু ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে বাঁচাতে মুসলিম বিশ্বের প্রতি আবেদন জানান।' কিন্তু ১৬ই আগস্ট ঢাকা বেতার দেশের নাম পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করে।

এর পরেও ভুট্টো হাল ছাড়েননি। মোশতাক সরকারের প্রতি দূতিয়ালি করতে তিনি সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব সফর করেন। তবে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের কথা ভুট্টো আগে থেকেই জানতেন। ১৯৭৫-এর জুনে পাকিস্তান সামরিক একাডেমিতে ভুট্টো বলেন, 'এ অঞ্চলে শিগগিরই কিছু পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।' (*জুলফিকার ভুট্টো অব পাকিস্তান*, স্ট্যানলি ওলপার্ট)

বঙ্গবন্ধু হত্যা-ষড়যন্ত্রকারীরা লন্ডনেও সক্রিয় ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট লন্ডনের *দি টাইমস* পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত অভিযোগ সম্বলিত একটি ডাহা মিথ্যা বিজ্ঞাপন (ডাবল কলাম বক্স) প্রকাশিত হয়। 'ক্যাম্পেইন ফর সোস্যাল ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' নামে একটি কল্পিত অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঐ বিজ্ঞাপনটি দেওয়া হয়। উত্তর লন্ডনের ৬১ নম্বর ফিনসবারী পার্ক রোড, লন্ডন এন-৪ ঠিকানা ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনে বলা হয় : 'বাংলাদেশে শুধু মানুষ নয়, মনুষ্য ধর্মও বিপদাপন্ন।' বিজ্ঞাপনটির তিন লাইনব্যাপী শিরোনামে বলা হয়, 'অনুগ্রহ করে বাংলাদেশকে ভুলবেন না, এটিও একটি একনায়কত্বাধীন দেশ। এ দেশে শুধু মানুষ নয়, মনুষ্য ধর্মও বিপদাপন্ন।' আসলে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ঠিকানাটি ছিল ভুয়া। পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত তাঁর 'মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা' বইতে বলেন, 'বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা লন্ডন ও জেদ্দায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি বৈঠকের পর লন্ডনের একটি পত্রিকায় ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে 'ক্ষুদে ডিক্টেটর' আখ্যা দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।' ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ই আগস্ট জাতির জনকের হত্যা দিবসে বিজ্ঞাপনটি *দি টাইমস*-এ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যা ষড়যন্ত্র ছিল আরও বিস্তৃত। গত ৪৭ বছরে অনেক কিছু জানা গেলেও সবকিছু জানা যায়নি। ভুট্টো-কিসিঞ্জার ছাড়াও আরও অনেক দেশ ও অনেক চক্রান্তকারী এতে নিশ্চিতভাবেই জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশে মোশতাক, জিয়া, এরশাদ, ফারুক, রশীদ, নূর, ডালিম, মাহবুব আলম চাষী ছাড়াও সামরিক-বেসামরিক আরও বহু ব্যক্তি মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রে জড়িত। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ওসমানী, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল তাহের, জেনারেল মঞ্জুরসহ আরও অনেকের ভূমিকাই স্বচ্ছ ছিল না। পাকিস্তান প্রত্যাগত ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের অনেকেই আড়াল থেকে ঘাতক চক্রকে মদদ দিয়েছেন। জনক হত্যা ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে বেশি লাভবান ব্যক্তি হচ্ছেন জিয়া ও এরশাদ। শুরু থেকেই এই দুইজন জড়িত ছিল বলেই আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা এদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। আর অতি চালাক বেঈমান খোন্দকার মোশতাক ৮০ দিনের নবাবী শেষে আউট হয়ে বাংলার 'দ্বিতীয় মীরজাফর' হিসেবে নিজের নামকে খোদাই করে নিয়েছে।

জনক হত্যাকাণ্ডে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কথা একটি মাত্র নিবন্ধ লেখা একেবারেই সম্ভব নয়। লিফশুলজ তাঁর গ্রন্থে বহু দলিলপত্রভিত্তিক তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন, লেডিজ ক্লাবের তুচ্ছ ঘটনার জের হিসেবে শেখ মুজিব নিহত হননি। তিনি প্রমাণ করেছেন, লেডিস ক্লাবের ঘটনার বহু আগেই মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুজিব হত্যাকারীরা যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। তাছাড়া স্ট্যানলি ওলপার্ট তাঁর গ্রন্থে মুজিব হত্যা ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী জেড এ ভুট্টোর জড়িত থাকার দলিলপত্র হাজির করেছেন। সবশেষে, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তথ্যসূত্র

১. *বাংলাদেশ: এন আনফিনিশড রেভল্যুশন*, লরেঞ্জ লিফশুলজ

২. *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড*, মিজানুর রহমান খান

৩. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: কয়েকটি ঐতিহাসিক দলিল*, আবদুল মতিন

৪. *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর*, কর্নেল শাফায়াত জামিল

মোহাম্মদ শাহজাহান: বঙ্গবন্ধু গবেষক, মুক্তিযোদ্ধা এবং সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক, bandhu.ch77@yahoo.com

আমার বাবা

সিরাজউদ্দিন আহমেদ

করিমুন্নেসার খুব শখ ছেলেকে সে পড়াশোনা শেখাবে।

গ্রামে একটি মাত্র পাঠশালা। হরি বাবুর পাঠশালা। সে যখন ছোটো ছিল তখনও দেখেছে, বাপ-চাচাদের কাছে শুনেছে তারাও হরি বাবুর পাঠশালায় দু-এক ক্লাস পড়েছে। এখনও হরি বাবুর পাঠশালা আছে। তিন কালের পাঠশালা। হরি বাবু তখন যুবক ছিলেন, স্কুলটা সুন্দর ছিল, অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল। এখন হরি বাবুর চুলদাড়ি সাদা হয়েছে। মাথার উপর দোচালা ছাউনি ছাড়া পাঠশালার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পনেরো-বিশজন ছাত্রছাত্রী আপনমনে পড়ে চলেছে।

করিমনের মনে সংশয়। ছেলের হাত শক্ত করে ধরে আছে। তার ছেলেকে পাঠশালায় নেবে তো? বিব্রত জড়োসড়ো হয়ে বলল, মাস্টারমশাই, পোলাটারে আপনের পাঠশালায় নিয়া আসলাম।

মুখ তুলে ঝুলেপরা চশমা কানে ঠিকমতো এঁটে নিলো। মা-ছেলেকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, আজকাল আমার স্কুলে কেউ আসে না। স্কুলের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছিস। কত নতুন স্কুল, নতুন বিল্ডিং হয়েছে, সেখানে যা।

আপনার পাঠশালা আমার গ্রামের পাঠশালা, আমার ঘরের কাছে। তাছাড়া আপনার পাঠশালায় আমার হাতেখড়ি হইছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার পাঠশালায় আমার ছেলে পড়বে এটাই আমার খায়েশ।

মাস্টারমশাই একটা খাতা টেনে নিলেন, ছেলের নাম বল।

পাঁচ বছরের বিজয়ের মনে আজ অন্যরকম আনন্দ। ওদের ছোটো আঙিনা ছেড়ে এই প্রথম বাইরে এসেছে। মা ছাড়া খেলাধুলা, কথা বলার তেমন কোনো বন্ধু বিজয়ের নেই। পাঠশালায় ভর্তি হলে তার কত বন্ধু হবে। মা বলার আগে বিজয় চটপট বলে ফেলল, আমার নাম বিজয় করিম।

এইটা কেমুন নাম?

বিজয় দিবসে হইছে, ১৬ই ডিসেম্বর, তাই নাম রাখছি বিজয়। করিমুন্নেসার পোলা তাই করিম। বিজয় করিম।

হরি বাবু মৃদু হেসে বলল, তুই দেখছি খুব সাহসী মেয়ে! ছেলের নাম রেখেছিস তোর নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে। ওর বাপে কিছু কয় নাই?

করিমন চুপ করে রইল।

– বাপের নাম ক ?

– বাপ নাই।

– মইরা গেছে ? নাম তো মরে নাই । নাম ক ?

করিমনের মুখ কালো হয়ে গেল। বিজয় বিব্রতবোধ করছে। মার চোখের দিকে তাকাতে পারে না। করিমনের চোখে ক্রোধ। মনে ক্ষোভ। অপরাধীর মতো নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

হরি মাস্টার জিজ্ঞেস করল, কোন বাড়ি?

সিকদার বাড়ি। মফিজ সিকদারের বড়ো মাইয়া করিমুন্নেসা।

চশমার কাঁচ মুছে ভালো করে তাকাল। হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে হরি মাস্টারের মুখে আনন্দের আভা ছড়াল। বলল, এইবার তোরে চিনবার পারছি। মুক্তিযোদ্ধা করিমন। এইটা বুঝি তোর সেই পোলা? বাবার নাম কী দেই ক তো?

করিমন বলল, আপনে যা ভালো বুঝেন তাই দেন। আপনে আমার গুরুজন, আমার সবই জানেন। দেশ স্বাধীন হইল, বাপ-ভাই আমারে ঘরে জায়গা দিলো না। আমার বাচ্চা হইচে বেপারি বাড়ির গোয়ালঘরে।

– হায়! ঈশ্বর, বিজয়ী বীরাঙ্গনা! কোথায় বিজয়ের জয়মাল্য পরিয়ে পরম ভক্তি-শ্রদ্ধায় গ্রহণ করবে, তার আশ্রয় জুটল গোয়ালঘরে। দুঃখ করিস না মা, যিশুও গোয়ালঘরে জন্মেছেন।

– আমি নিজে আর্মি ক্যাম্পে ধরা দিয়া গেরামের মাইয়াগো ইজ্জত

বাঁচাইছি, এইটা কেউ বুঝতে চায় না।

– ভেঙে পড়িস না করিমন, তুই একজন মুক্তিযোদ্ধা।

– ভাঙি নাই মাস্টার মশাই। সেই জন্য পোলারে আপনার কাছে নিয়া আসছি।

শোন করিমন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা। তোর, আমার, বাংলাদেশের সকলের পিতা। তোর ছেলের বাবার নাম দিলাম শেখ মুজিবুর রহমান।

করিমন বলল, মাস্টার বাবু, সকলে হাসাহাসি করব।

– বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, অনেক বাঙালি হাসাহাসি করে নাই? ব্যঙ্গ করে নাই? কইছে, ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার। পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ করবে! হাসিতে কী হইছে? দেশ তো স্বাধীন হইছে।

করিমনকে নিয়েও গ্রামের মানুষও কম হাসাহাসি করে নাই।

ওই করিমন, বিয়া নাই সাদি নাই পোলা পাইলি কই ?

আল্লাহ দিছে।

সবই তো আল্লাই দেয়। বাপেরও দরকার হয়।

তোর পোলার বাপের নাম কী ?

আমারে পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্পে ধইরা নিছিল সেইটা শুনো নাই ?

শুনছি তো। সেই জন্যে জানবার চাই পোলার বাপ একজন, না অনেকজন ?

আমি কেমনে কমু , আমি কি ডাক্তর?

তয় পোলা তর সোন্দর হইছে। ফর্সা ধবধবা। মনে হয় বাপ পাকিস্তানি পাঞ্জাবি।

এ সুযোগে রসের স্বাদ ছাড়তে কেই-বা রাজি হয়। আরেকজন ঠোঁট চেটে জিজ্ঞেস করল, কতশত মানুষ ফূর্তি করেছে, কার বীজে হইছে করিমন কইবে কেমনে ?

ক্রোধে করিমন চেঁচিয়ে ওঠে, সন্তান হয় মায়ের পেটে। মায়ের রক্ত, মাংস, আদর, ভালোবাসা খেয়ে সে পৃথিবীতে আসে। সন্তান মায়ের। কোন হালার বীজে হইল কী না হইল তাতে কী আসে যায়। তোমাগো পোলাপান যে তোমাগো বীজে হইছে এইটা ঠিক জানোতো?

তোমার মুখে এতবড়ো কথা!

সাবধান, আমি মুক্তিযোদ্ধা করিমন। তিনজন পাকিস্তানি আর্মি খুন করছি। আরও পাঁচজন রাজাকার খুন করতে আমার হাত কাঁপবো না। আমি রামদা নিয়া ঘুমাই। রাইতে আমার ঘরের দরজায় টোকা দাও, ঘোরাঘুরি করো, কারা করে সব জানি। এই রকম কত বাড়িতে বীজ ফেলতে যাও? আমার বাড়ি যাওনের আগে ভাইবা-চিন্তা যাইও। আস্তা কল্লা নিয়া ফিরতে পারবা না।

বেগতিক দেখে রস নিতে আসা লোকজন কেটে পড়ে। করিমন সহজ মেয়েমানুষ না। মানসম্মান বাঁচাতে ওর থেকে দূরে থাকা ভালো।

বিজয়ের মনে আজ আনন্দ থইথই করছে। এতদিন তার বাবা ছিল না। কিংবা ছিল, গোপনে ছিল। বাবার নাম জানত না। বাবার অভাবে নত মাথায় ভয়ে-গ্লানিতে পথ চলত। বাবার কথা জানতে চাইলে মা ক্ষেপে যেত। তখন মাকে সে খুব ভয় করত। মা শুধু তাকে বকেই ক্ষান্ত হতো না। সে তার ভাগ্য, বাবা-মা, ভাইবোন, আল্লাহ সবাইকে দোষারোপ করত। কাঁদত। দু-চারটি পরিবার ছাড়া গ্রামের কেউ তাদের সঙ্গে মিশতো না। মা সারাটা দিন ক্ষেতে কাজ করত। বিজয় মাকে কোনো কষ্ট দিতে চায় না। ভয় হয় মা যদি তাকে ছেড়ে চলে যায়।

গতকাল মা তাদের বেড়ার ঘরে বাবার একটি ছবি টানিয়ে দিয়েছে। কী যে সুন্দর! তার আশপাশে কত ছেলেমেয়েদের বাবাদের দেখেছে, তার বাবার মতো এত সুন্দর কারোর বাবা না। কিছুক্ষণ পর পর সে বাবার ছবির সামনে এসে দাঁড়ায়। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে কেমন লজ্জা লাগে। ঘরে কেউ নেই। মা এখন ফসলের মাঠে। বিজয় বাবার ছবির সামনে এসে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে ডাকল, বাবা, ও বাবা, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। বিজয়ের বাবার নাম বঙ্গবন্ধু।

রাতে শুয়ে বিজয় মার গলা জড়িয়ে ধরে, মা, তুমি আমার কত ভালো মা।

করিমন জিজ্ঞেস করল, আজ এত খুশি যে?

তুমি যে আইজ বাবারে আইনা দিছো।

বঙ্গবন্ধু তোমার একার বাবা না। যাদের বাবা নাই উনি তাদের সকলের বাবা। বঙ্গবন্ধু আমারও বাবা। আমার আপন বাবা-মা আমারে বাড়ি থেইকা বাহির কইরা দিছে। অথচ জাতির পিতা আমাগো সম্মান দিয়া বলছে, তোরা আমার মা। তোরা মুক্তিযোদ্ধা, জাতির গর্ব বীরাঙ্গনা। আমরা সম্মান নিয়া বাঁচতে পারি সেই জন্যে মাসে মাসে ভাতা দেয়। আমাগো জমি দিছে, ঘর দিছে ।

মা বীরাঙ্গনা কী?

করিমন থমকে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না। পরে বলল, বাবা, এখন বুঝবা না। বড়ো হলে বুঝতে পারবা। বড়ো হওয়ার পর যদি বাংলাদেশের সব বীরাঙ্গনাকে আমার মতো ভালোবাসতে পারো, মা ডাকতে পারো, তাদের ভালোর জন্য কাজ করতে পারো, বুঝব তুমি বঙ্গবন্ধুর উপযুক্ত ছেলে। আর তা যদি না পারো বুঝব তুমি রাজাকারের ছেলে। আমার কেউ না।

মা, রাজাকার কী ?

যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের খুন করেছে, ঘরবাড়ি লুট করছে, মা-বোনের ইজ্জত নিছে, বঙ্গবন্ধুরে খুন করছে তারা রাজাকার।

ফুঁসে উঠল বিজয়, আমি রাজাকারদের কোনোদিন মাফ করব না। আমার বাবাকে যারা খুন করেছে আমি এর প্রতিশোধ নেব। বাংলাদেশ থেকে সব রাজাকার যদি তাড়াতে না পারি আমি বঙ্গবন্ধুর ছেলে না।

করিমন ছেলেকে বুকে টেনে নিলো, এ কাজের জন্য অনেক পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা না করলে তুমি বড়ো হতে পারবা না। বড়ো হতে না পারলে তুমি রাজাকার তাড়াইতে পারবা না।

মা আমি অনেক পড়াশোনা করব। বাংলাদেশ থেকে রাজাকার তাড়িয়ে দেব। আমি বঙ্গবন্ধুর ছেলে।

করিমন বিজয়কে বুকে টেনে নিলো।

শেখ মুজিবের মৃত্যু নেই

সোহরাব পাশা

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বাঁচার আর্তনাদ করোনি
ঘাতকের কাছে
চেয়েছিলে তোমার লাশ যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়
বাংলার মাটিতে, বাংলাকে এতটাই
ভালোবাসতে তুমি।

ফিরে আসা মানে স্বদেশের মৃত্তিকার
কাছে ফেরা, বঞ্চিত ও দুঃখী মানুষের কাছে ফেরা;
তুমি ফিরে এসেছো তোমার স্বপ্নময় পদ্মা, মেঘনা,
যমুনা, মধুমতীর কাছে, রাত্রির ঘুম ভাঙানো
পাখির কাছে, ভোরের কাছে;

মৃত্যুকূপ খোলেনি তার নৈঃশব্দ্য জানালা কপাট
মানুষ জেনেছে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যু নেই।

তোমার নাম ইতিহাসের উজ্জ্বল শিরোনাম,
অনিবার্য পাঠ সময়ের;
তুমি ক্ষিপ্র অন্ধকার সময়কে থামিয়ে দিয়েছো
জীবনের চেয়েও প্রিয় এই বাংলাদেশের জন্যে,
ছিনিয়ে এনেছো এই সুবর্ণ সকাল
একটি লাল সূর্যের সুদীপ্ত পতাকা

বঙ্গবন্ধু তোমার নাম চির অম্লান, দোল খাবে
ওই পতাকায়
একথা কেবল ইতিহাসের নয়– ভূগোলেরও,

তুমি ফিরে আসবেই যেভাবে রাত্রি শেষে ফেরে উজ্জ্বল ভোর।

একগুচ্ছ রক্তগোলাপ

মিলন সব্যসাচী

ব্যথিত বুকের ভেতরে বেদনাবিদ্ধ চেতনার গর্জন
অন্তহীন যাতনা আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় ওই-
মৃত্যুর দামে কেনা রক্তাক্ত দিগন্তের শোকসমুদ্র সৈকত
হৃদয়-বীণার ছিন্ন তারে নৈঃশব্দ্যে সুর সাধে বাউল বাতাস।

দুঃস্বপ্নের দীর্ঘরাতে অঝোর ধারায় একাকী শ্রাবণ কাঁদে
দশদিগন্তে শোকের মাতম, পিতৃহারা কান্নার কোলাহল
অফুরন্ত বেদনায় ক্রমাগত ডুবে যায় অভিমানী চাঁদ
শুভ্রজ্যোৎস্নার পেয়ালা ভেঙে অবলীলাক্রমে কারা যেন-
কলঙ্কের কালিমা লেপ্টে দিয়ে মেতে ওঠে মহোৎসবে।

যে মানুষটি আজীবন এই মাটি, মানুষকে ভালোবেসে
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেঁচে থাকার দীর্ঘস্বপ্ন দেখেছিলেন
মহাকালের অক্ষয় অধ্যায় অবশেষে রক্তবর্ণে লেখা হলো
সেই বীর বাঙালির নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ...।

যার জন্য বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই পেলো প্রিয় বাংলাদেশ
সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এই বীরের জাতি আজ গর্বিত
আমরা ঘৃণ-ঘাতক আঘাত হেনে তাঁর বুক করেছি ক্ষতবিক্ষত
কতটা অকৃতজ্ঞ হলে এমন সব ঘৃণিত কাজ করা যায়?

যিনি বুকের রক্তধারায় লিখেছেন কাঙ্ক্ষিত শব্দ– স্বাধীনতা
অসীম আকাশে উল্লাসে উড়িয়ে দিয়ে এক ঝাঁক শ্বেত-পায়রা
শুভ্রডানায় রক্তের অক্ষরে তিনি লিখেছিলেন 'বাংলাদেশ'
মৃত্যুময় শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভেঙে মুখরিত কোলাহলে–
সোনালি রৌদ্দুরে ভরে দিলেন দুখিনি মায়ের অশ্রুস্নাত আঙিনা
জন্মভূমি জননীর আঁচলে বেঁধে দিলেন একগুচ্ছ রক্তগোলাপ
ভুলে থাকার অজুহাতে আজ বার বার তাকেই মনে পড়লো।

কালো দিবস

আ. শ. ম. বাবর আলী

বঙ্গবন্ধু! তোমার জন্য বুকটা আমার জ্বলে,
তোমার জন্য ভালোবাসা আমার বুকের তলে।
ভালোবাসা ছিল তোমার এই জাতিটার জন্য,
সেই তোমারে খুন করল কয়টা পশু বন্য।
সারা জীবন আপনার সুখ বিসর্জন যে দিয়ে,
মোদের জন্য স্বাধীনতা আনলে তুমি নিয়ে।
জীবনপণ সংগ্রামেতে ছিলে দেশের তরে,
স্বাধীনতা এনে দিলে বাঙালিদের ঘরে।
সেই বাঙালির মধ্য থেকে কয়টি হায়েনা প্রাণী,
তোমায় করল হত্যা তারা, করল নাফরমানি।
পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট সেইদিন ভোর রাতে,
হত্যা করল তোমায় তারা স্ত্রী-পুত্র সাথে।
শিশুপুত্র রাসেল তোমার কী দোষ করেছিল?
কোন দোষেতে কামাল-জামালের সস্ত্রীক প্রাণ নিল?

পনেরো আগস্ট কালো দিবস ইতিহাসের পাতায়,
বুকটা আমার যায় যে ভেঙে তোমার স্মৃতিগাথায়!

তাঁর কাছে এই জাতি

গোলাম নবী পান্না

স্বদেশের প্রতি যাঁর টান অফুরান
কখনও ফুরায় না তাঁর অবদান।

এ জাতির ভাবনায় মায়া দেন ঢেলে
এগিয়েই যান তিনি পিছুটান ফেলে।

মৃত্যুর ভয়টাকে জয় করে শেষে
শান্তির বার্তাটা দিয়ে যান দেশে।

স্বাধীনতা, ভাষা আর বিজয়ের মাঝে
স্বপ্নটা এঁকেছেন সফল এ কাজে।

সফলতা নিয়ে বুকে সাহসের সাথে
জাতি এক বন্ধনে তাই মালা গাঁথে।

আর তাতে অবদান যাঁর নাম লেখা
একজন ছাড়া আর যায় না তো দেখা।

প্রিয় 'শেখ মুজিবুর রহমান' তিনি
তাঁর কাছে এই জাতি আজীবন ঋণী।

আজও দেশের মানুষ কাঁদে

বাবুল তালুকদার

শোকের মাতন বইছে দেশে কাঁদছে মানব হৃদয়
বঙ্গবন্ধু হুকুমে আজ মুক্তিযোদ্ধার বিজয়।
ষড়যন্ত্রের শিকার হলো সপরিবার লোক
কুচক্রীরা প্রাণ কেড়ে নেয় মানবজাতির শোক।

পনেরো আগস্ট ফিরে আসলে মানব প্রাণ কাঁদে
চিহ্নিত আজ কুচক্রীরা পরছে এখন ফাঁদে।
বিচার হলো খুনিদের আজ মা ও মাটির দেশে
পালিয়ে থাকে ভিনদেশে আজ কত ছদ্মবেশে।

অন্তরে আজ বাঙালিদের শোকের ছায়া বয়
এই মাটিতে কত মানুষ অশান্তিতে রয়।
বঙ্গবন্ধুর জন্য আজ কাঁদছে দেশের লোক
মানবজাতি সারা বিশ্বে পালন করছে শোক।

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা আর হবে না বিশ্বে
বিশ্ববাসী স্বীকার করে শেখ মুজিবুর শীর্ষে
ভাষণ শুনে সাতই মার্চে কেঁপে উঠে বিশ্ব
স্বাধীন বাংলার মানুষেরা হয়নি আজও নিঃস্ব।

বঙ্গবন্ধুর কলমসেনার চোখে আজও পানি
কলঙ্কের বোঝা নিয়ে টানছে দেশের ঘানি
যুদ্ধ চলে লেখালেখির চলবে চিরকাল
বঙ্গবন্ধুর কলমসেনা বাংলার দিকপাল।

শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর কন্যা
অন্তরে আজ স্মৃতিগাথা দুচোখে বয় বন্যা
শোকের ছায়া ঘিরে আজও থাকছে দেশের মাটিতে
ভক্তরা আজ কাঁদছে দেশে মা ও মাটির ঘাঁটিতে।

পঁচাত্তরের শোকের আগস্ট

চিত্তরঞ্জন সাহা চিতু

শোকের আগস্ট আসলে ফিরে কষ্ট বুকে লাগে,
কালো রাতের দৃশ্যগুলো আজও মনে জাগে।
জাতির পিতা খুন হয়ে যায় রক্তে ভাসে দেশ,
এই বাঙালির স্বপ্ন দেখা সব হয়ে যায় শেষ।

খুন হয়েছে বেগম মুজিব বাদ যায়নি কেউ,
ধানমন্ডি সেই বাড়িতে সেদিন শোকের ঢেউ।
শিশু রাসেল কামাল জামাল রক্ত দিলো তারা,
নির্মমতার সাক্ষী সবাই আজকে দিশেহারা।

খুন হয়েছে আরও কত চোখেতে জল ঝরে,
ভয়াবহ সেই দৃশ্যগুলো কেবলই মনে পরে।
পুত্রবধূ ভাগনে মণি ভাইয়ের বুকে গুলি,
পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি কি আর ভুলি।

একুশ বছর হয়নি বিচার হায়রে মানবতা,
যার জন্য আসল এদেশ আসল স্বাধীনতা।
সেই মানুষের সব খুনিদের সেদিন দৃশ্য দেখি,
কষ্ট বুকে হারিয়ে ভাষা কষ্টগুলো লেখি।

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা আসল দেশে ফিরে,
নতুন সূর্য উঠল আবার নৌকা ভিড়ল তীরে।
কঠোর হস্তে করল বিচার খুনির হলো ফাঁসি,
জনকহারা কোটি মানুষের ফুটলো মুখে হাসি।

আগস্ট, রক্তাক্ত বাংলাদেশ

কামাল বারি

আগস্ট, রক্তাক্ত বাংলাদেশ!
আগস্ট, কলঙ্কিত বাংলাদেশ!
আগস্ট, রক্তের আখরে লেখা ইতিহাস!
আগস্ট, কাল-কুলাঙ্গারের রক্ত-তিয়াস!
আগস্ট, শোক-কালো দগ্ধ শোকাকুল মাস ...!
হায় আগস্ট! হায় আগস্ট!
হায় পনেরোই আগস্ট!
লাল-সবুজের সোনার বাংলায়
পাষণ্ড আঘাতের কালদিন!

... রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত সবুজ স্বদেশ নিথর নিস্পন্দ!
হায়, মুক্তিযুদ্ধজয়ী বাঙালির সেই দুঃসহ শোকাবহ দিন!
সেই শোকাকুল বাংলার আকাশ বাতাস পাহাড় নদী
বৃক্ষের চোখের জল–
কখনও কোনোদিন ভুলবে কি বাঙালি?
বাংলাদেশের বর্ধিষ্ণু শস্যক্ষেত
ভুলে যাবে কি সেই অন্ধদিন?
জানি, বাঙালির তাবৎ চোখ সর্বশোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল সেদিন;
সেখান থেকে ঝরেছে কি বেদনার অশ্রু?
জ্বলেছে কি ক্রোধের অগ্নি?
হায়, সে-কী দুঃসহ শোকার্ত পাথরে মৌন হাহাকারের দিন!

হায়, পৃথিবীর সমগ্র ভুল হত্যাকাণ্ডের থেকেও অধিক ভুল

সেই মহাবেদনাত্মক হত্যাযজ্ঞ!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ সেই কুপুত্র কুলাঙ্গার পিতৃহন্তারক গোষ্ঠীর ওপর!

হায়, মহাভুলের খলনায়কেরা
করেছিলে সেদিন কী-যে ভুল!
পিতা চিরশৌর্যকণ্ঠ
অমিত বাৎসল্যে জানতে চায়–
কী চাস্ তোরা?
হায়, কুলাঙ্গার জবাব দিয়েছে
গুলির বিকট বীভৎস ভাষায়!
তখনই তাদের নির্মম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোটা অন্ধ গুলি
তুমুল ক্রোধে ফিরে এসে ছেদ করতে পারত নিজেদের খুলি!
কিন্তু না– হয়নি তা...!
হায়, বাঙালি!
বাংলার বেদনাত্মক মহাকাব্যের খুব কি পড়েছিল দায়?

... খলনায়কেরা করেছিল কী-যে ভুল!
মাকে চেনে না– মাটি চেনে না–
মাতৃভূমির সুউচ্চ শির সইতে পারে না!
ত্রাসের সে-কী নষ্ট উল্লাস!

হায়, কী-যে ভুল!
মাকে চেনেনি– মাতৃভূমি বাংলাদেশ চেনেনি!
জানে না তো, এদেশের মঙ্গল মাটি
একটি বীরের রক্তক্ষতচিহ্ন থেকে
জাগিয়ে দিতে পারে শত কোটি দুঃসাহসী বীর!
খল জানেনি, খল চিরকাল কলঙ্কিত!
ব্যর্থ– নষ্ট– ইতিহাসের ধূলি ...!
খল জেনেছে কি–
মহাশোক থেকে বাঙালি পেয়েছে মহাশক্তি?

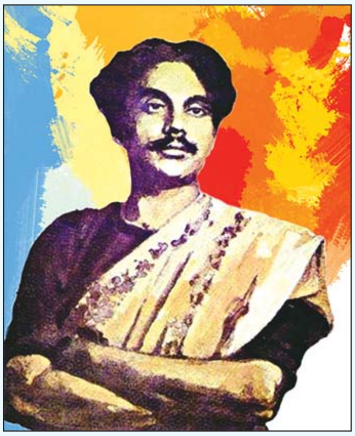

নজরুলের শিশুসাহিত্য

ইফ্‌ফাত আরা দোলা

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে বিখ্যাত। সমাজের সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে চিরকাল তিনি সোচ্চার ছিলেন। অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে কবিতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন বলে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তবে তাঁর এই প্রতিবাদী মনের আড়ালে ছিল এক সবুজ কোমল মন, যে মন ছিল শিশুর মতোই দুরন্ত-চঞ্চল। যে মন হারিয়ে যেত কল্পনার সীমাহীন সীমানায়, যে মনটি ছিল শিশুর মতোই সংবেদনশীল। কবিতায় তিনি নিজেই বলেন, 'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর'। তিনি শিশুদের জন্যও লিখেছেন অনেক ছড়া, কবিতা, গান ও নাটিকা। শিশু-কিশোরদের মনস্তত্ত্ব বোঝার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। নিজের ভেতরের শিশুসত্তাটিকে পরম যত্নে লালন করেছিলেন বলেই শিশুদের মনোজগৎ সম্পর্কে তাঁর এত স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তাই ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা ছড়া-কবিতা শিশুদের মনের গভীর কোণটিকে ছুঁয়ে গেছে সহজেই। সেখানে উঠে এসেছে চিরায়ত বাংলার শিশু-কিশোরদের প্রকৃত স্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে ১৮৯৯) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর পিতা ছিলেন কাজী ফকির আহমদ আর মা ছিলেন জাহেদা খাতুন। বেশ কয়েকজন ভাইবোনের মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হওয়ায় তাঁর ডাকনাম হয় দুখু মিয়া। তাঁর বয়স যখন মাত্র নয় বছর তখন তাঁর বাবা মৃত্যুবরণ করেন। এরপর অভাব-অনটনের মাঝে নজরুল বড়ো হতে থাকেন। অর্থের অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় তাঁর। পরিবারের হাল ধরার জন্য সেই অল্প বয়সেই গ্রামের লেটো দলের সঙ্গে যুক্ত হন। লেটো দলের নাটকের জন্য তিনি গান ও পালা লিখতেন। ১৯১০ সালে নজরুল লেটো দল ছেড়ে ছাত্রজীবনে ফিরে আসেন। রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল স্কুলে পড়ার সময় তিনি কবিতা, ছড়া ও গান লিখতেন। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন একটি ঘটনা ঘটে। স্কুলের কড়িকাঠে ছিল একটি চড়ুই পাখির বাসা। সেখান থেকে একটি চড়ুইছানা নীচে পড়ে যায়। নজরুল সেই পাখির ছানা কুড়িয়ে নিয়ে মই বেয়ে উঠে তাকে তার বাসায় মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। চড়ুইছানাটি পড়ে যাবার পর তার অসহায়ত্ব আর চড়ুই মায়ের আর্তনাদ কিশোর নজরুলের মনে গভীর দাগ কাটে। এই ঘটনা নিয়ে তিনি 'চড়ুই পাখির ছানা' নামে একটি কবিতা লিখেন–

> মস্ত বড় দালান-বাড়ির উই-লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
> ছোট্ট একটি চড়াই-ছানা কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছে মা'কে।
> 'চুঁ চা' রবে আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে,
> মায়ের পরান ভাবলে– বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছা-য়ে।

ছোটোবেলা থেকেই তিনি এমন সুন্দর সুন্দর ছড়া-কবিতা লিখে শিক্ষকদের সুনাম অর্জন করেন। বড়ো হয়ে যখন তিনি পুরোপুরি সাহিত্যে মনোনিবেশ করলেন তখনও তিনি ভুলে যাননি শিশু-কিশোরদের কথা। ছোটোদের জন্য তিনি প্রচুর ছড়া-কবিতা লিখেছেন। *ঝিঙে ফুল* ও *ঘুম জাগানো পাখী* নামে ছোটোদের জন্য দুটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন তিনি। তাঁর অনূদিত গ্রন্থ *কাব্য আমপারাও* তিনি শিশু-কিশোরদের কথা মাথায় রেখেই লিখেছেন।

শিশুদের কাছে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা 'খুকি ও কাঠবেড়ালি'। এ কবিতা শিশুদের প্রতি নজরুলের ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো এক কাঠবেড়ালির সঙ্গে একটি ছোট্ট খুকির পেয়ারার লোভে ভাব জমানো, তাকে নানা প্রলোভন দেখানো, শেষ পর্যন্ত খুকিকে পেয়ারা না দেওয়ায় কাঠবেড়ালির প্রতি অভিমান করার মধ্য দিয়ে এই দীর্ঘ কবিতাটিতে শিশুমনের সারল্য প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে।

> কাঠবেড়ালি ! কাঠবেড়ালি ! তুমি আমার ছোড়দি হবে ? বৌদি
> হবে ? হু !
> রাঙা দিদি ? তবে একটা পেয়ারা দাও না ! উঃ !
> ....
> দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ যে ছুট ? অ'মা দেখে যাও !
> কাঠবেড়ালি ! তুমি মরো ! তুমি কচু খাও !!

শুধু কাঠবেড়ালিই নয়, তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে জলে থাকা কোলাব্যাঙের কথাও। 'ও ভাই কোলাব্যাঙ' কবিতাটি শিশুদের নির্মল আনন্দ দেয়–

> ও ভাই কোলাব্যাঙ ! ও ভাই কোলাব্যাঙ !
> সর্দি তোমার হয় না বুঝি,
> ও ভাই কোলাব্যাঙ !
> সারাটা দিন জল ঘেঁটে যাও,
> ছড়িয়ে দুটি ঠ্যাং।

গ্রামে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরদের শৈশবে গাছে উঠে ফলমূল চুরি করে খাওয়াটা নিছকই বিনোদনের অংশ। ডানপিটে ছেলেদের বিকেলবেলা লিচু চুরি করতে যাওয়া, যাওয়ার পর তারা কেমন বিপদে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা প্রতিজ্ঞা করে আর কোনোদিনও চুরি করতে যাবে না– এমন ঘটনা নিয়ে 'লিচু চোর' নামে এক আকর্ষণীয় কবিতা লিখেন নজরুল। কবিতাটি পড়তে পড়তে শিশুরা হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে–

> বাবুদের তাল-পুকুরে
> হাবুদের ডাল-কুকুরে
> সে কি বাস্ করলে তাড়া,
> বলি থাম্, একটু দাঁড়া !
> ....
> যাব ফের ? কান মলি ভাই,
> চুরিতে আর যদি যাই !
> ....
> সে কি ভাই যায় রে ভুলা–
> মালির ঐ পিট্‌নি গুলা !

কি বলিস্ ? ফের হপ্তা ?
তৌবা- নাক-খপ্‌তা।

প্রকৃতিপ্রেমী নজরুল ছোটোদেরও প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাইলেন। যে ঝিঙে ফুল বাড়ির উঠোনের এক কোণে মাচায় ফুটে থাকে, সহজলভ্য অথচ সকলের মনোযোগ কাড়ে না, তাই নিয়েও তিনি লিখেছেন 'ঝিঙে ফুল' কবিতাটি। কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবির মুগ্ধতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

ঝিঙে ফুল ! ঝিঙে ফুল !
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে-কুল-
ঝিঙে ফুল !

কৌতূহলী শিশুমনকে আরও অনুসন্ধিৎসু করে দিয়েছেন তিনি। ঘরের মাঝে বন্দি না থেকে, জগৎটাকে চেনার-জানার আহ্বান 'সংকল্প' কবিতায় তিনি জানিয়েছেন এভাবে–

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।

ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানো ছোট্ট রঙিন প্রজাপতিকে দেখে শিশুমনে কী কী প্রশ্ন জাগে, তা দেখা যায় 'প্রজাপতি' কবিতায়–

প্রজাপতি ! প্রজাপতি ! কোথায় পেলে ভাই !
এমন রঙিন পাখা !
টুক্‌টুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা !

ছোটোদের জন্য লেখা নজরুলের কবিতাগুলোর মধ্যে কিছু ছিল আনন্দদানের উদ্দেশে আর কিছু ছিল আনন্দদানের পাশাপাশি তাদের মনোজগৎ নির্মাণের লক্ষ্যে। এসব কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে স্বদেশপ্রেম, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জাগরণের বাণী, দুঃসাহসী অভিযান আর বীরত্বগাথা। শিশু-কিশোরদের জীবনের মূলমন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি তাঁর কবিতায়। নজরুলের শৈশব ছিল গল্পের মতোই রোমাঞ্চকর। ছিল ডানপিটেমি আর দুরন্তপনায় পূর্ণ। তাঁর শৈশব ছিল মুক্ত-স্বাধীন। তাই তাঁর কবিতায় শিশুরাও তাঁরই মতো বাঁধনহারা। তিনি যেমন নির্ভীক ছিলেন, তাঁর শিশু-কিশোর চরিত্রগুলোও তেমনই অকুতোভয় ছিল। সকল বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে, ভয়কে জয় করে, নতুনকে জানার আকাঙ্ক্ষা তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট শিশু-কিশোর চরিত্রগুলোও তাই একেকজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী। তারা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, তারা ঝরনার মতো চঞ্চল, তারা প্রকৃতির মতো সচ্ছল। এমন একটি কবিতা 'খোকার সাধ'-এ খোকা মাকে বলছে–

আমি হবো সকালবেলার পাখি
সবার আগে কুসুমবাগে
উঠবো আমি ডাকি।
....
আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে মাগো
রাত পোহাবে তবে।

ছাত্রদের হতে হবে নির্ভয়। কোনো বিপদে তারা ভয় করবে না। সব বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে তারা অধিকার আদায় করে নেবে। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে নজরুলের জাগরণী কবিতা। ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি লেখেন 'চল্ চল্ চল্' কবিতাটি। এ কবিতা বাংলাদেশের রণ সংগীতের মর্যাদা পেয়েছে।

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্ রে চল্ রে চল্।
উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

ছাত্রদের নিয়ে তিনি আরও একটি কবিতা লিখেছেন, নাম 'ছাত্রদলের গান'। এ কবিতায় তিনি বলেন,

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।

ছোটোদের জন্যে নজরুলের লেখা কবিতাগুলো এক নির্মল আনন্দের উৎস। তিনি নিজেও ছিলেন ছোটোদের মতোই অস্থিরচিত্ত, হাস্য-কৌতুকপ্রিয় ও বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল। তিনি বিশ্বাস করতেন শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে। শিশুদের মনোজগৎ নির্মাণে তাই তিনি ছিলেন সচেষ্ট। তাঁর বেশিরভাগ শিশুতোষ রচনা আনন্দদানের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও কিছু কিছু রচনা আছে যার মাধ্যমে তিনি সচেতনভাবেই শিশু-কিশোরদের ভেতরটাকে জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ, স্বদেশের মুক্তিদানে সকল অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎগামিতা থেকে বেরিয়ে আসতে এই শিশু-কিশোরের দলই একদিন নেতৃত্ব দেবে– এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাঁর শিশুতোষ কবিতা পড়লে মনে হয়, এ যেন কোনো ছোট্ট শিশুরই মনের গোপন সাধ। শিশু-কিশোররা তাঁর কবিতা পড়ে একদিকে যেমন পায় অনাবিল আনন্দ, তেমনই পায় জীবন গড়ার শিক্ষা।

বাংলা সাহিত্যের শিশুতোষ শাখাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোমল হাতের স্পর্শে পূর্ণ হয়েছে। শিশুদের জন্য রচিত তাঁর ছড়া, কবিতা, গল্প, গান ও নাটক আজও সমান জনপ্রিয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবিকে সপরিবার কলকাতা থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং সরকারিভাবে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৬ সালে কবিকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আমাদের জাতীয় কবি।

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জন্য যে অমূল্য সম্ভার রেখে গেছেন, তা সত্যিই গর্বের। তিনি আবালবৃদ্ধবনিতা সবশ্রেণির পাঠকের মণিকোঠায় বেঁচে থাকবেন চিরকাল। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি লিখেন–

মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই,
যেন গোরে থেকে মুয়াযযিনের আযান শুনতে পাই।

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। জাতীয় কবির প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালোবাসা।

ইফ্‌ফাত আরা দোলা: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও শিক্ষক, ইনজিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জুলাই ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৬ হাজার ২২৯ ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর করেন – পিআইডি

পঞ্চগড় ও মাগুরা জেলাসহ ৫২টি উপজেলাকে গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা

কে সি বি তপু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। তাই তিনি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে পিছিয়েপড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন এবং একই বছর তিনি সারা দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। ১৯৯৭ সালে প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যারাক, ফ্ল্যাট, বিভিন্ন প্রকার ঘর ও মুজিববর্ষের একক গৃহে মোট ৫ লক্ষ ৭ হাজার ২৪৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একটি গৃহ কীভাবে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। মুজিববর্ষে 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না'– প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। সমগ্র দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে মুজিববর্ষে জমিসহ সেমিপাকা ঘর দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। 'ক' শ্রেণির পরিবার : সকল ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র পরিবার। 'খ' শ্রেণির পরিবার : সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির সংস্থান আছে কিন্তু ঘর নেই এমন পরিবার। প্রাথমিকভাবে 'ক' শ্রেণির পরিবারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি নিষ্কণ্টক খাস জমি, সরকারিভাবে ক্রয়কৃত জমি, সরকারের অনুকূলে কারও দানকৃত জমি অথবা রিজিউমকৃত জমিতে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি ও গৃহ প্রদান ইতিহাসে প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে আরও ২৬ হাজার ২২৯টি জমিসহ ঘর হস্তান্তর করেছেন। এর মাধ্যমে দেশের ৪৯২টি উপজেলার ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৪৫ জন মানুষ নিজের ঠিকানা পেল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে পঞ্চগড় ও মাগুরা জেলার সবগুলো উপজেলাসহ ৫২টি উপজেলাকে গৃহহীনমুক্ত ও ভূমিহীনমুক্ত উপজেলা হিসেবেও ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জুলাই ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি এই ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের কাছে ঘরের দলিল ও চাবি হস্তান্তর করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আশ্রয়ণ একটি মানুষের ঠিকানা। জীবন-জীবিকার একটি সুযোগ, বেঁচে থাকা, স্বপ্ন দেখা এবং তা বাস্তবায়ন করা। যে বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, সে বাংলাদেশের কোনোও মানুষ যেন ঠিকানাবিহীন না থাকে, তাদের জীবনটা যেন অর্থহীন হয়ে না যায়, তাদের জীবনটা যেন সুন্দর হয়, সেই লক্ষ্য নিয়েই এই উদ্যোগটা সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু নিয়েছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর হাতে গড়া বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষের জন্য

অন্তত বসবাসের একটি জায়গা করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এই আশ্রয়ণ।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হন পাঁচটি প্রকল্প এলাকার সঙ্গে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে– লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চরকলাকোপা আশ্রয়ণ প্রকল্প, বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার গৌরম্ভা আশ্রয়ণ প্রকল্প, ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চর ভেলামারী আশ্রয়ণ প্রকল্প, পঞ্চগড় সদর উপজেলার মাহানপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার জাঙ্গালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প।

ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলাগুলো হচ্ছে– ঢাকার নবাবগঞ্জ, মাদারীপুরের মাদারীপুর সদর, শরীয়তপুরের ডামুড্যা, কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী, টাঙ্গাইলের গোপালপুর, মানিকগঞ্জের ঘিওর, সাটুরিয়া, রাজবাড়ীর কালুখালী, ফরিদপুরের নগরকান্দা, নেত্রকোনার মদন, ময়মনসিংহের ভালুকা, নান্দাইল, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া, জামালপুরের বকশীগঞ্জ, চট্টগ্রামের পটিয়া, কর্ণফুলী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর, রামগঞ্জ, ফেনীর ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ, পঞ্চগড়ের আটোয়ারী, পঞ্চগড় সদর, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া, বোদা।

এছাড়া ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত উপজেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে– দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী, নীলফামারীর ডিমলা, নওগাঁর রাণীনগর, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি, রাজশাহীর মোহনপুর, চারঘাট, বাঘা, বগুড়ার নন্দীগ্রাম, দুপচাঁচিয়া, নাটোরের বাগাতিপাড়া, পাবনার ঈশ্বরদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু, সাতক্ষীরার তালা, মাগুরা সদর, শ্রীপুর, মহম্মদপুর, শালিখা, ঝালকাঠির কাঠালিয়া, পটুয়াখালীর দশমিনা।

আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় গৃহহীন ও ভূমিহীন আছে কি না সেটা খুঁজে দেখার নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের একটা দায়িত্ব রয়েছে। দলমত নির্বিশেষে যে গৃহ ও ভূমিহীন থাকবে, আমরা তাদের ঘর, ঠিকানা এবং জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করে দেব।

দেশের উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেওয়া নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি আওয়ামী সরকারের নেওয়া নানামুখী পদক্ষেপের কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা চাচ্ছি আমাদের দেশে শতভাগ ভূমিহীন-গৃহহীনদের পুনর্বাসন হবে। প্রত্যেকটা মানুষ তার ঠিকানা পাবে। এটাই আমরা করতে চাচ্ছি।'

পাঁচটি প্রকল্প স্থানে বিপুলসংখ্যক উপকারভোগী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগ নেতা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা। তাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা আপনাদের কর্মস্থলে খুঁজে দেখেন একটি মানুষও ভূমিহীন আছে কি না, গৃহহীন আছে কি না।'

গণভবন প্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পের ওপর ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়াসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক এই ঘোষণার জন্য পঞ্চগড় প্রান্তে উপজেলা সদরের মাহানপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকা বিশেষভাবে সাজানো হয়। জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী ও পঞ্চগড়-২ আসনের সংসদ সদস্য নূরুল ইসলাম সুজন ও পঞ্চগড়-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. মজাহারুল হক প্রধান, রংপুর বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল ওয়াহাব ভূঞা, জেলা প্রশাসক মো. জহুরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, জেলা পরিষদ প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত সম্রাট, বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রশাসনের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ এই উদ্যোগে জেলার ১৫ হাজার ১৫৯ জন আশ্রয়হীন মানুষ তাদের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পান। জেলায় মোট ৪ হাজার ৮৫০ গৃহহীন পরিবারের মধ্যে এর আগে তিন দফায় তিন হাজার ৪৩৭ জনকে গৃহ প্রদান করা হয়। ২১শে জুলাই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর এক হাজার ৪১৩ পরিবারকে জমিসহ একক ঘর প্রদানের মাধ্যমে পঞ্চগড় জেলাকে দেশের প্রথম গৃহ ও ভূমিহীনমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হিসেবে মাগুরা জেলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহার জমিসহগৃহ মাগুরা জেলার ৬৭২টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে হস্তান্তর উপলক্ষে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার জাঙ্গালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মাগুরা জেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করেন। এ উপলক্ষে মহম্মদপুর ভেন্যু থেকে সরাসরি যুক্ত হন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাড. সাইফুজ্জামান শিখর, মাগুরা-২ আসনের সাংসদ ড. বীরেন শিকদার, জেলা প্রশাসক ড. আশরাফুল আলম। এ সময় উপকারভোগীদের মধ্য থেকে শাহীনুর বেগম ও প্রিয়াঙ্কা সরকার তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আ. ফ. ম. আব্দুল ফাত্তাহ, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ কুমার কুন্ডু, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ

আবু আব্দুল্লা হেলকাফী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রামানন্দ পাল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল ছিদ্দিকী লিটন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আ. হাই মিয়াসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২০২২ পর্যন্ত ১ লাখ ৮৫ হাজার ১২৯টি বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২০২১ সালের ২৩শে জানুয়ারি ৬৩ হাজার ৯৯৯ গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার তাদের মাথার উপর ছাদ পায়। আর ২০২১ সালের ২০শে জুন আশ্রয়ণ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি পরিবার ঘর পায়। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে দেশব্যাপী মোট ৬৭ হাজার ৮০০টি ঘর দেওয়া হচ্ছে। এই ৬৭ হাজার ৮০০ ঘরের মধ্যে ২০২২ সালের ২৬শে এপ্রিল ৩২ হাজার ৯০৪টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে, ২০২২ সালের ২১শে জুলাই ২৬ হাজার ২২৯টি জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয় এবং বাকি ৮ হাজার ৬৬৭টি ঘর নির্মাণাধীন রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস জানান, ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ঘরের নির্মাণের জন্য ৪০২৮ দশমিক ৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় চর অঞ্চলের জন্য ১ হাজার ২৪২টির মতো বিশেষভাবে নকশাকৃত ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ঘূর্ণিঝড় কিংবা বন্যার মতো যে-কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়টি মাথায় রেখে বিশেষভাবে স্থানান্তরযোগ্য করে ঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে করে বাড়িগুলো অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে সরকার ঘরগুলোকে অধিকতর টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু করে গড়ে তুলতে ঘরগুলোর নকশা পরিবর্তন করে। এতে ঘরগুলোর নির্মাণ খরচ বেড়ে যায়। আর এজন্যই এখন গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষরা দুই শতাংশ জমির ওপর আরও উন্নতমানের টিনশেডের আধা-পাকা ঘর পাবে। ঘরগুলোকে অধিকতর টেকসই করে গড়ে তোলায় প্রতিটি ঘরের নির্মাণব্যয় ১ লাখ ৯১ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ লাখ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ঘরগুলোকে অধিকতর টেকসই করে নির্মাণ করতে মজবুত কড়ি কাঠ, পাথরের সর্দল ও রি-ইনফোর্স কংক্রিট কলাম (আরসিসি) পিলার ব্যবহার করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ থেকে মোট ৫ লাখ ৯ হাজার ৩৭০টি পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত পরিবারগুলোকে তিন মাসের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হবে। সরকারের নীতি অনুযায়ী, এই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, বিধবা ও অসমর্থ মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, গোরস্থান, পুকুর ও রাস্তাঘাটও তৈরি করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে। গৃহহীনদের কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্যও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশ্রয়ণ প্রকল্পটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র আবাসনের সাথে এর একটি বিশেষ যোগাযোগ আছে। বিভিন্ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে পথে কেবলমাত্র এই গৃহ নির্মাণ প্রকল্পটিই হতে পারে প্রধান পদচিহ্ন। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, নারী ক্ষমতায়নের মতো ক্ষেত্রগুলোতে এই আবাসন প্রকল্প ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিবিড় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হোক। বাংলাদেশ হোক গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মডেল হোক বিশ্বের রোল মডেল। গৃহহীন ও ভূমিহীন যারা জমিসহ ঘর পেয়েছে তাদের আনন্দ থাকুক অমলিন।

কে সি বি তপু: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

প্রথমবারের মতো এআইপি সম্মাননা প্রদান

প্রথমবারের মতো কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৩ ব্যক্তিকে 'কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এগ্রিকালচারালি ইম্পর্টেন্ট পারসন–এআইপি)' সম্মাননা ২০২০ প্রদান করা হয়েছে। এআইপিরা সিআইপির মতো বিভিন্ন সুবিধা পাবেন। ২৭শে জুলাই রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসিবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার। এআইপি নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবছর মোট পাঁচটি বিভাগে সর্বোচ্চ ৪৫ জনকে এআইপি সম্মাননা প্রদান করা হবে। এআইপি কার্ডের মেয়াদ এক বছর।

এআইপি সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন– কৃষি উদ্ভাবন বিভাগে বাউধান-৩-এর জাত উদ্ভাবনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান, দুটি বীজ আলুসহ মোট ১০টি সবজির জাত উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণে এ আর মালিক সিডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতাউস সোপান মালিক, মেহগনি ফলের বীজ থেকে তেল তৈরির জন্য ফিউচার অর্গানিক ফার্মের সৈয়দ আব্দুল মতিন, আলীম পাওয়ার ট্রিলার উদ্ভাবনের জন্য আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের আলীমুছ ছাদাত চৌধুরী।

কৃষি উৎপাদন বা বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বিভাগে এআইপি সম্মাননা প্রাপ্ত ছয়জন হলেন– নাটোর সদরের দৃষ্টান্ত অ্যাগ্রো ফার্ম অ্যান্ড নার্সারির মো. সেলিম রেজা, ঠাকুরগাঁওয়ের চামেশ্বরীর মো. মেহেদী আহসান উল্লাহ চৌধুরী, ঝালকাঠি সদরের এশা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাগ্রিকালচার ফার্মের মো. মাহফুজুর রহমান, পিরোজপুর জেলার নাজিরপুরের জাগো কেঁচো সার উৎপাদন খামারের মালিক মো. বদরুল হায়দার বেপারী, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার নুর জাহান গার্ডেনের মো. শাহবাজ হোসেন খান এবং কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের বিছমিল্লাহ মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও খামারের মো. সামছুদ্দিন (কালু)।

কৃষি সংগঠন বিভাগে নওগাঁর শাহ্ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও জাদুঘরের জাহাঙ্গীর আলম এআইপি মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বিভাগে নির্বাচিত দুজন হলেন– পাবনার ঈশ্বরদীর মোছা. নুরুন্নাহার বেগম এবং মো. শাহজাহান আলী বাদশা।

প্রতিবেদন: সোনিয়া হক

একাত্তরের মা-জননী

সুজন বড়ুয়া

রাত ১টা ৩০ মিনিট। হঠাৎ চারদিক থেকে গোলাগুলির শব্দ। শেখ ফজিলাতুন নেছা হতচকিত হয়ে উঠলেন। সব ঘরের জানালা খোলা। না জানি আবার কোন অঘটন ঘটে! অজানা আশঙ্কায় তিনি ঝটপট উঠে ঘরের জানালা বন্ধ করতে ছুটে গেলেন। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে তিনি প্রায় স্তম্ভিত। এ কী সর্বনাশ! মিলিটারি এসেছে! স্পষ্ট দেখতে পেলেন পাশের বাড়িতে মিলিটারি ঢুকছে। মুহূর্তেই কাঁপন শুরু হয়ে গেল শরীরে। কাঁপতে কাঁপতে তিনি দিশা হারিয়ে শোবার ঘরের দিকে ছুটলেন।

স্বামী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিছানায় গা এলিয়ে শুয়েছিলেন। তাঁর চোখে ঘুম নেই। তিনি সম্পূর্ণ সজাগ। একটু আগে তিনি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর ঘোষণা বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

শেখ ফজিলাতুন নেছা হন্তদন্ত হয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর হাঁসফাঁস অবস্থা। বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলতে ফেলতে জানালেন, শুনছেন? মিলিটারি আসছে।

বঙ্গবন্ধু নির্বিকার। তিনি জানতেন এমন একটা কিছু ঘটবে। বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, তুমি কী করে জানলে রেণু?

–রাস্তার আলোতে আমি দেখতে পেয়েছি। গোলাগুলির শব্দ কি আরও কাছে মনে হচ্ছে না?– বলতে বলতে বঙ্গবন্ধু আর রাসেলকে টেনে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন তিনি। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল, কামাল-জামাল তাঁদের ঘরে রয়েছে। মনটা উসখুস করতে লাগল।

এদিকে গোলাগুলির শব্দ আরও বেড়ে গেল। এরমধ্যে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে একটি গুলি ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল। সেইসঙ্গে শোনা গেল– জোয়ান পজিশন নাও।

ফজিলাতুন নেছা এবার জামালের ঘরের দিকে ছুটলেন। জামালকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন নিজেদের ঘরে। ভয়ার্ত চেহারায় চোখ রগড়াচ্ছে জামাল। বঙ্গবন্ধু বললেন, তোমরা এখানে থাকো। আমি বের হই। আমাকে না পেলে ওরা থামবে না। তখন ক্ষয়ক্ষতি আরও বেশি হবে।

বলতে বলতেই বেডরুমের মধ্যে দুই পা এগিয়ে বঙ্গবন্ধু হুঙ্কার দিলেন, স্টপ ফায়ারিং।

গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু দেখতে পেলেন, বাড়ির প্রধান ফটক ঘিরে রেখেছে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা। তিনি বললেন, তোমাদের এখানে বড়ো অফিসার কেউ আছে?

বঙ্গবন্ধু নীচতলায় নেমে এলেন। তাঁকে নাগালের মধ্যে পেয়ে দুজন সেনা বেয়নেট উঁচিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাঁর সামনে এগোতে চাইল। আরেকজন কর্মকর্তা তাদের বাধা দিয়ে থামালেন। তিনি সামরিক কায়দায় বঙ্গবন্ধুকে বললেন, স্যার, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। ইউ হ্যাভ টু গো উইথ আস।

–ওকে, আই'ম কামিং, ওয়েট। বলেই বঙ্গবন্ধু আবার ভেতরের ঘরের দিকে এগোলেন। বড়ো ছেলে শেখ কামাল এরই মধ্যে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। বঙ্গবন্ধু কামালকে বললেন, আমার পাইপের ব্যাগ আর সুটকেসটা দাও।

বঙ্গবন্ধুর পেছন পেছন একজন কর্নেল, একজন মেজর আর দুজন সিপাহি উপরে এসে পজিশন নিলো।

কামালের সঙ্গে শেখ ফজিলাতুন নেছাও বঙ্গবন্ধুর সুটকেস গুছিয়ে দিতে ব্যস্ত। ছোটো ছেলে রাসেল এতক্ষণ ঘুমঘুম চোখে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। গভীর রাতে ঘরের মধ্যে পাকিস্তানি জোয়ান দেখে হঠাৎ তার কেমন লাগল কে জানে? আচমকা চিৎকার করে কেঁদে উঠল সে। জামাল পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে তাকে।

কর্নেল জামালের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার বাবাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, দুঃখিত।

জামাল ও কামাল থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রইল। বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে শেখ ফজিলাতুন নেছাকে বললেন, এখানে যদি ভালোভাবে থাকতে না পারো, দেশের বাড়িতে চলে যেও। ছেলেমেয়েদের দেখে রাখবা, লেখাপড়া শেখাবা, মানুষ করবা।

গ্রেপ্তার তাঁর জন্য নতুন কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু শেখ ফজিলাতুন নেছা বুঝে গেছেন এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। এবার তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার কারণে গ্রেপ্তার হলেন। এ বড়ো কঠিন পরিস্থিতি। চোখের পানি ফেলে কোনো লাভ নেই। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে স্বামীর প্রস্থান পর্ব দেখছেন তিনি। ওপরে ওপরে শক্ত পাথর, কিন্তু ভেতরে ভেঙে গুড়িয়ে যাচ্ছে সব, ভেতরে চলছে তাঁর তুমুল তোলপাড়। পাকিস্তানি সেনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাঁকে? আর কি ফিরে পাব মানুষটাকে? আর কি আমাদের দেখা হবে কখনো?

প্রিয়তম স্বামীর জীবন্ত ছবিটা চোখের আড়াল হয়ে গেল নিমিষেই। নির্জীব নিষ্প্রাণ ফজিলাতুন নেছা একসঙ্গে তিন ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। এভাবেই যেন নতুন করে বাঁচার অবলম্বন খুঁজলেন তিনি। মনে মনে বললেন, আল্লাহ, আমার বুকের মানিকদের তুমি রক্ষা করো।

মায়ের মনের অবস্থা আঁচ করতে পেরে বড়ো ছেলে কামালই কথা বলে উঠল প্রথম, আম্মা, আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শহরের অবস্থা ভালো নয়। রাস্তায় রাস্তায় সেনাবাহিনী ট্যাংক নামিয়েছে। অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙালিদের ওপর। আগামীকাল থেকে দেশের অবস্থা কোনদিকে মোড় নেবে জানি না। আমাদের এ বাসায় থাকা নিরাপদ হবে না। তুমি অনুমতি দাও আম্মা, আমি এখনই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাই। আমার জন্য দোয়া করো। তোমরাও সকালের মধ্যে এ বাসা ছেড়ে চলে যেও আম্মা।

ফজিলাতুন নেছা সহসা কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। বাড়ির পেছন দিক দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বড়ো ছেলে শেখ কামাল। বুকের একটি অংশ যেন খসে পড়ে গেল হঠাৎ। দ্বিতীয় বারের মতো বুকে পাথর চাপা দিলেন তিনি।

ভোরের আলো ফোটার আগে আগে মেজো ছেলে জামাল আর ছোটো ছেলে রাসেলকে নিয়ে নিজেও পথে নামলেন ফজিলাতুন নেছা। ৩২ নম্বর সড়কের পাশের বাড়িতেই আশ্রয় নিলেন তিনি। কিন্তু দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার জন্য মনটা হঠাৎ উতলা হয়ে উঠল তাঁর।

পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ রূপ নেবে, বঙ্গবন্ধু আগেই তা অনুমান করেছিলেন। মেয়ে জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়াকে আলাদা বাসা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। ওয়াজেদ মিয়া ধানমন্ডির ১৫ নম্বর রোডে নীচতলায় একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে নিয়ে তিনি ছিলেন সেই নতুন বাসায়। তাই গত রাতের বিভীষিকাময় ঘটনার সাক্ষী হতে হয়নি তাঁদের।

দুই

২৬শে মার্চ সকালটা নিয়ে এল ঘোরতর এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বার্তা। এমন ভীতিকর সকাল বাঙালির জাতীয় জীবনে আর আসেনি। এমন রক্তমাখা অশ্রুভেজা সকাল ঢাকার মানুষ আর প্রত্যক্ষ করেনি। গত রাত থেকেই পাকিস্তানি সেনারা মেতে উঠেছে বন্য উল্লাসে। নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চলেছে শহরের অলিতে-গলিতে। এরই মধ্যে রটে গেল চরম দুঃসংবাদটি, পাকিস্তানি শাসকচক্র বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেপ্তারের পূর্বে অবশ্য দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে ওয়্যারলেস যোগে স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন তিনি।

সকালে একইসঙ্গে আনন্দ-বেদনার এক মিশ্র অনুভূতি হলো ওয়াজেদ মিয়ার। মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা যেমন তাঁকে উল্লসিত করল, তেমনি শ্বশুর-আব্বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার সংবাদ তাঁকে দুশ্চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত করল। বুঝতে পারলেন দেশের সার্বিক অবস্থা আরও খারাপ হবে– এতে কোনো সন্দেহ নেই। যুদ্ধও শুরু হয়ে যেতে পারে। পরিস্থিতি এখন ভীষণ প্রতিকূল! নিজের সামনে তিনি দেখতে পেলেন সমস্যার পাহাড়। একদিকে সন্তানসন্ততিসহ বাস্তুহারা শাশুড়ি-মাতা, অন্যদিকে সন্তানসম্ভবা স্ত্রী। বলতে গেলে দুটি পরিবারের দায়িত্বই এসে পড়েছে তাঁর কাঁধের ওপর। ওয়াজেদ মিয়া মাথা ঝাঁকি দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। এখন দুই পরিবারের মধ্যে একমাত্র সমর্থ পুরুষ আমি। না, এখন ধৈর্য হারালে চলবে না। ঠান্ডা মাথায় সংসারের হাল ধরতে হবে। এই মুহূর্তে একতাই হতে পারে শক্তি। সবাইকে নিয়ে এক জায়গায় থাকতে হবে। তবে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের আশপাশে নয়। তাহলে শাসকগোষ্ঠীর নজরদারিতে থাকতে হবে সারাক্ষণ। এখন নিরাপদ দূরত্বে আত্মগোপন করে থাকাই শ্রেয়।

অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত পাকা করলেন ওয়াজেদ মিয়া। ধানমন্ডির নতুন বাসা ছেড়ে দিলেন তিনি। দ্রুত একটি বাসা ঠিক করলেন খিলগাঁও এলাকায়। স্ত্রী, শাশুড়িসহ জামাল, রেহানা, রাসেলকে নিয়ে উঠলেন সেই বাসায়।

দেখতে দেখতে শহরের পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। এরমধ্যে জানা গেল, ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

অনেক ছাত্র মারা গেছে। শিক্ষক আবাসগুলোও তছনছ করে দিয়েছে। নামকরা কোনো শিক্ষককেই রেহাই দেয়নি। শিক্ষকদের সঙ্গে পরিবারের অনেক সাধারণ সদস্যও প্রাণ হারিয়েছে। ঢাকা নিউমার্কেট এলাকা জ্বলেপুড়ে ছারখার। পিলখানার ইপিআর সদর দপ্তর আর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস জ্বলছে। সেই থেকে চারদিকে পাকিস্তানি সেনাদের দৌরাত্ম্য। চলছে নির্বিচারে মারধর, জ্বালাও-পোড়াও। প্রাণ হাতে নিয়ে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে সবাই। প্রতি রাতে কারফিউ, দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। এই কয় ঘণ্টায় চলে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজ। কেনাকাটা, বাজারঘাট আর ছোটাছুটি। একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যায় না কেউ। জায়গায় জায়গায় কোথাও কোথাও খণ্ড যুদ্ধের কথা শোনা যায়। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোরে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি সেনা জোয়ানদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। সাধারণ মানুষরাও কোথাও কোথাও পাকিস্তানিদের রুখে দাঁড়াচ্ছে শোনা যেতে লাগল।

কদিন যেতে না যেতে শোনা গেল আরেকটি বেশ আশা জাগানিয়া খবর। কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়েছে। প্রবাসী সরকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন তাজউদ্দীন আহমদ। আরও জানা গেল, এই সরকার বাংলাদেশকে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবরকম কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এই খবর অনেকের মতো ফজিলাতুন নেছাকেও আশান্বিত করে তুলল। তবে দুই মেয়ে, দুই ছেলে আর বড়ো জামাতা ওয়াজেদ মিয়াকে নিয়ে খিলগাঁওয়ের এক ভাড়া বাসায় সেঁধিয়ে আছেন তিনি। বাইরের কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, যোগাযোগ নেই। পাছে তাঁদের আসল পরিচয় বেরিয়ে যায়– এই ভয় তাড়া করে সব সময়। এরমধ্যেই মনপ্রাণ কেমন করে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ। সেই যে ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা মানুষটাকে বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, তারপর আর কোনো খোঁজ নেই তাঁর। কোথায় রাখা হয়েছে তাঁকে, কেমন আছেন কেউ বলতে পারে না। বাবাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর সেই যে বড়ো ছেলে কামাল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল, সেই-বা কোথায় আছে, কেমন আছে জানার জন্য মনটা বড়ো অধীর হয়ে ওঠে ফজিলাতুন নেছার। কিন্তু মনের ব্যথা মনেই গুমরে মরে শুধু। কাউকে তিনি বলতে পারেন না, কেউ তা দেখতেও পায় না। এ এক কঠিন পাষাণভার। নিজেকে গুটিয়ে রাখেন চুপচাপ।

বাড়ির এটাসেটা কেনাকাটার জন্য বাইরে পাঠানো হয় না কাউকে। এসব কাজ ওয়াজেদ মিয়া একাই করেন। তিনি সরকারি কর্মকর্তা। এই পরিচয়ে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া-আসা করে থাকেন। এত নিরিবিলি ও সতর্ক থাকার পরও এখানে তাঁদের পরিচয় গোপন থাকল না বেশিদিন। পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে প্রথমে নিজেদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলল বাড়িওয়ালা। তারপর বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিলো সরাসরি। অগত্যা এ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন তাঁরা।

এবার বাসা ভাড়া নেওয়া হলো মগবাজার এলাকায়। প্রথমে একতলা একটি বাড়িতে থাকলেন কিছুদিন। কিন্তু এ বাড়ির লোকগুলো বড়ো সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। কেমন কেমন করে যেন তাকায়। কদিন পরেই ছেড়ে দেওয়া হলো এ বাড়ি। এবার ভাড়া নিলেন অন্য একটি বাড়ির দোতলা। এ বাড়িটি একটু ছায়া ছায়া আড়ালময়। এখানকার আত্মগোপন কাল বেশ কাটছিল। তবু শেষ রক্ষা হলো না আর। পাকিস্তানি বাহিনী ঠিক হানা দিলো এ বাড়িতে। পুরো বঙ্গবন্ধু পরিবারকে এখানে আবিষ্কার করে ফেলল একদিন। অবশেষে ১২ই মে পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধু পরিবারকে সেখান থেকে আবার নিয়ে এল ধানমন্ডি এলাকায়।

তিন

এবার পুরো পরিবারকে বন্দি করে রাখা হলো ধানমন্ডি ১৮ নম্বর (বর্তমান ৯/এ) রোডের ২৬ নম্বর বাড়িতে। এখানে শুরু হলো সত্যিকারের বন্দি জীবন। অন্ধকার বাড়ি। কোনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই। ছোটোখাটো কোনো আসবাবও বাড়িতে নেই। এখানে শুরু হলো মেঝে-মাটির অতি সাধারণ জীবন।

দেশের কেমন এক বিদঘুটে অবস্থা। অস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানি বাহিনী। শোনা যাচ্ছে দিন দিন আরও সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ আমদানি বাড়াচ্ছে তারা। পুরো দেশ এখন তাদের দখলে। দেশটাকে আরও মুঠোয় পুরে নেওয়ার জন্য দালালদের নিয়ে এক বাহিনী গঠন করছে, তার নাম দিয়েছে রাজাকার বাহিনী। তাদের সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা যখন যেমন ইচ্ছে জ্বালাও-পোড়াও করে ভীতি ছড়াচ্ছে দিকে দিকে। কখনো বিকট শব্দে শহর কেঁপে ওঠে হঠাৎ। এ কেমন সন্ত্রাসের রাজত্ব কে জানে? তবে এখন ঢাকা শহরে রাতে কারফিউ দেওয়া হচ্ছে না আর। কারফিউ না দিলেও দিন-রাত এখন সমান। রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের আনাগোনা একেবারে কম।

তবে সরকার দেখাতে চায় সব ঠিকঠাক মতো চলছে। এরমধ্যে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সব খুলে দেওয়া হয়েছে। বড়ো জামাতা ওয়াজেদ মিয়া যথারীতি অফিসে যাতায়াত শুরু করেছেন। তিনি পরমাণু শক্তি কমিশনের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। সরকারি চাকুরে হওয়ায় তাঁর বাইরে যাতায়াতে বাধা নেই। কিন্তু বাড়ির অন্য সবার বাইরে যাওয়া নিষেধ। বাড়ির গেটে পাকিস্তানি সৈন্য-সিপাহিদের কড়া পাহারা। জামাল সারাদিন মনমরা হয়ে বসে থাকে অন্ধকার ঘরে। রাসেলেরও কিছু করার নেই। খেলাধুলায় মেতে থাকবে এমন কোনো সামগ্রীও এখানে নেই। তারও সময় কাটতে চায় না।

রাসেল একদিন সকালে এক সিপাহিকে বলে বসল, ম্যায় স্কুল জাউঙ্গা।

সিপাহির কী মনে হলো কে জানে? সে বলল, আপকি স্কুল কিতাব কাহা হ্যায়?

রাসেল সাহস করে আবার বলল, ম্যারে তামাম কিতাবে ৩২ নম্বর মে হে। হামকো কিতাব লানে দো।

এদিকে সেই ২৫শে মার্চের পর থেকে ৩২ নম্বর রোডের বাসাটা দখল করে রেখেছে পাকিস্তানিরা। পাকিস্তান আর্মির দপ্তর বানানো হয়েছে সেখানে। বাড়ির প্রকৃত বাসিন্দাদের কারোই সেখানে প্রবেশের অধিকার নেই এখন। আর সেখান থেকে ছেলেমেয়েদের বইখাতা ফেরত পাওয়া নেহাত দুরাশা ছাড়া কিছু নয়। তবু বাড়ির কর্ত্রী ফজিলাতুন নেছা বড়ো ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ভেতরে ভেতরে। দস্যুগুলো বাড়িটার কী অবস্থা করছে কে জানে? বাড়ির সবকিছুই তাঁর কাছে অতি মূল্যবান ও প্রিয়। তবে জেলখানায় বসে স্বামীর লেখা রোজনামচার খাতাগুলোর কথা এক মুহূর্তও ভুলতে পারেননি তিনি। বড়ো কন্যা হাসিনাকে তিনি বলে রাখলেন, হাচু মা, কখনো ওই বাড়িতে যেতে পারলে তোর বাবার লেখা রোজনামচার খাতাগুলো যে-কোনোভাবে নিয়ে আসতে হবে, বুঝেছিস?

হাসিনা মনে মনে ভাবল, মার কী দূর কল্পনা! ঐ বাড়িতে যাওয়ার

সুযোগ কি কোনো কালে পাওয়া যাবে? চরম হতাশায় ডুবে সবাই ভুলেই গেল কথাটি। কিন্তু কী আশ্চর্য! একদিন সকালে সিপাহি ডেকে বসল রাসেলকে। বাড়ির ছোটো ছেলে রাসেলকে সিপাহি কেন ডাকবে? মা হতচকিত হয়ে নিজেই এগিয়ে এলেন কথা বলতে। সিপাহি জানাল, চান্স মিলগ্যায়া। ৩২ নম্বর সে আপনে কিতাবে লে আইয়ে। ইউ ক্যান গো টুডে অর টুমোরো মর্নিং, ওকে।

এত দুঃখের মধ্যেও কেমন এক খুশিতে নেচে উঠল ফজিলাতুন নেছার বুক। সত্যি, ৩২ নম্বরের বাড়িতে ঢোকা যাবে! আনন্দে চোখে পানি এসে গেল তাঁর। আহ্‌ প্রিয় সংসার-ভূমি!

শেখ হাসিনা বলল, মা আমি যাই? ওরা গেলে সব গুছিয়ে আনতে পারবে না।

–তুই যাইবি? এই শরীরে তুই যাইতে পারবি?

–পারব মা। কাছেই তো, অল্প পথ। জামাল আর রাসেল আমার সঙ্গে থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। আমি ঠিক সব খুঁজে নিয়ে আসব। তুমি চিন্তা করো না।

তিন ভাইবোন মিলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ৩২ নম্বরের বাড়িতে। পেছন থেকে তাঁদের অনুসরণ করল ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একটি আর্মি গাড়ি। বাড়িতে ঢোকার পরও পেছন পেছন সর্বক্ষণ লেগেই থাকল দুজন সৈন্য।

শেখ হাসিনা ভাইদের নিয়ে সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘুরতে থাকে এ ঘর ও ঘর । ঘরের কিছুই আর সাজানো অবস্থায় নেই। বাইরের দিকের ঘরগুলো আর বাবার লাইব্রেরি পুরোটাই ওলটপালট। বুকশেলফে বইয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সব বেহাত হয়ে গেছে। এরমধ্যে ভেতরের ঘরে রাসেল আর রেহানার কিছু বইখাতা পাওয়া গেল। বইখাতা নিতে নিতে এক ফাঁকে শেখ হাসিনা খুব সন্তর্পণে মায়ের ঘরে এসে ড্রেসিং আলমারি খুলল। মায়ের নির্দেশ মতো বাবার কারাগারের রোজনামচার খাতাগুলো পুরনো একটি কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে নিলো সঙ্গে। তারপর আলমারি ও ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে এল সবাই।

ছেলেমেয়েদের বাইরে পাঠিয়ে এদিকে ফজিলাতুন নেছার অস্থির অবস্থা। তাঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ছটফট করতে করতে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের দরজায়।

চার

অল্প কটি বইখাতা ফেরত পাওয়ার পর মাঝে মাঝে স্কুলে যেতে শুরু করল রাসেল-রেহানা। এটা আসলে লোক দেখানো যাওয়া। বেশিরভাগ দিনই ওরা যায় না। কারণ দিনগুলো বড়ো অনিশ্চয়তায় ভরা। কারোই মন ভালো নেই। কার ভাগ্যে কখন কী ঘটবে কেউ জানে না। ভালো কোনো খবর আসে না কোনো দিক থেকে। বাতাসের আগে আগে উড়ে আসে সব মন খারাপ করা খবর। এরমধ্যে সবচেয়ে মন খারাপ করা খবরটা এসেছে টুঙ্গিপাড়া থেকে। পাকিস্তানি সেনারা টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামে ছিলেন দুই মুরুব্বি, আব্বা শেখ লুৎফর রহমান আর আম্মা সায়ারা খাতুন। দুই মুরুব্বি এখন দিন কাটাচ্ছেন খোলা আকাশের নীচে। এই খবর শুনে বুক ফেটে কান্না এল ফজিলাতুন নেছার। মনে মনে তিনি আল্লাহর নাম স্মরণ করে বললেন, আল্লাহ, এ কী গজব দিলে তুমি! আমাদের বুড়া আব্বা-আম্মাকে তুমি রক্ষা করো।

এত দূর থেকে শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য কী করবেন তিনি? কাউকে দেখতে পাঠাবেন সে অবস্থাও নেই। নিরুপায় নিয়তি মেনে একা একা তড়পাতে থাকেন ফজিলাতুন নেছা।

এদিকে জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনার শরীর ভারী হয়ে এসেছে আরও। তাঁর মা হওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাঁর বিশেষ সেবাযত্ন দরকার। বাসায় রাখা এখন ঝুঁকিপূর্ণ। শরীর একেক সময় একেক রূপ নিচ্ছে। ওয়াজেদ মিয়া স্ত্রীকে আর বাসায় রাখতে নারাজ। দ্রুত একটি গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে এলেন তিনি। স্ত্রীকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করাবেন। সঙ্গে যাওয়ার জন্য মা ফজিলাতুন নেছাও তৈরি হলেন। কিন্তু বাধ সেঁধে বসল পাকিস্তানি সিপাহি, আপনি বাসার বাইরে যেতে পারবেন না। আপনার বাইরে যাওয়া নিষেধ।

ফজিলাতুন নেছা ভাবতে পারেননি সিপাহিরা এমন আচরণ করবে। মেয়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে না পেরে ভেতরে ভেতরে ভীষণ কষ্ট পেলেন তিনি। অসহায় আক্রোশে দগ্ধ হলেন মনে মনে। সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। সকালে উঠে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য আবার তৈরি হলেন তিনি। সিপাহিরা আবার বাধা দিলো তাঁকে, আপনাকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। আপনি বাসায় থাকেন।

ফজিলাতুন নেছা হাল ছাড়ার মানুষ নন। তিনি বললেন, আমি যাব। আমাকে যেতেই হবে।

সিপাহিরা এবার বলল, আপনি হাসপাতালে গিয়ে কী করবেন? আপনি কি ডাক্তার?

–আমি মা। এসময় মায়েদের মেয়ের পাশে থাকতে হয়।

ফজিলাতুন নেছা তাঁর মানবিক দাবি তুলে ধরে সিপাহিদের দুর্বল করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো ফল হয় না এতে। পাষাণও কখনো কখনো নরম হয়। ব্যতিক্রম শুধু পাকিস্তানি সৈন্য-সিপাহিরা, তারা অনড়, অনমনীয়।

ফজিলাতুন নেছা গজগজ করতে করতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

ব্যর্থ মনোরথে, গভীর হতাশায় উসখুস করতে করতে বাড়িতেই দিন কাটতে লাগল তাঁর। একদিন দুদিন করে চার দিন গত হলো। পঞ্চম দিন দুপুরবেলা। কন্যা শেখ হাসিনা ফিরে এল হাসপাতাল থেকে। তাঁর কোলে যেন এক টুকরো চাঁদের কণা ঝলমল করছে। কন্যা হাসিনার মুখে উপচে পড়ছে হাসি। সে পুত্রসন্তানের মা হয়েছে। ফজিলাতুন নেছা হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন নাতিকে। নাতির নাম রাখলেন 'জয়'। পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের জন্মের প্রাক্কালে পরিবারে যে নতুন শিশুর আগমন, তাঁর নাম 'জয়' ছাড়া আর কী হতে পারে? একরত্তি এই মানবশিশু জয় যেন কোনো অজানা থেকে অপার আনন্দ-বন্যা নিয়ে এসেছে পুরো পরিবারে। সবাই মেতে উঠল জয়কে নিয়ে। ফজিলাতুন নেছার জীবনেও জয় যেন দুঃখ-ব্যথা ভোলানো এক আশ্চর্য অতিথি। সারাদিনই তিনি মেতে থাকেন নাতিকে নিয়ে। নাতিকে নাওয়ানো-খাওয়ানো সবই নিজ হাতে করা চাই তাঁর।

পাঁচ

এই হাসি-আনন্দঘন পরিবেশ হঠাৎ থমকে গেল আবার। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ঘটল এক অঘটন। ফজিলাতুন নেছার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সকাল থেকে মেজো ছেলে জামালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। এমনিতে বাইরে কোথাও যায় না ছেলে। সারাদিনই শুয়ে-বসে থাকে বাসায়। সেই ছেলে বাসায় নেই সকাল থেকে। মায়ের মাথা ঠিক থাকে কী করে? মা ফজিলাতুন নেছা বিকেলে বাসার দ্বাররক্ষী পাকিস্তানি সিপাহিদের বললেন, আমার জামালকে তোমরা দেখেছ?

সিপাহিরা সবাই অবাক। আপনার মেজো ছেলে জামাল? কই, আমরা দেখিনি তো?

ফজিলাতুন নেছা এবার যেন চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাঁর মাথা কাজ করছে না। সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বাসার সামনে সর্বক্ষণ সিপাহিদের প্রহরা। বাড়ির কোনো লোকের যেখানে বাইরে যাওয়া নিষেধ, সেখানে জামাল গেল কোথায়? সিপাহিরা কেউ দেখল না! এটা কি সত্য? তিনি সিপাহিদের কথা গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি সিপাহিদের চেপে ধরার ভঙ্গিতে বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমরা জামালকে নিশ্চয় দেখেছ। তোমাদের সামনে দিয়ে ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়ার আর কোনো পথ নেই। আমি বলব জামাল কোথায় তোমরা জানো। তোমরাই জামালকে গুম করেছ।

বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ফজিলাতুন নেছা, আমার বুকের মানিক জামালরে, তুই কোথায় গেলিরে? তোরে আমি কোথায় খুঁজবরে বাপ। তোরে কোথায় পাব?

ছেলের জন্য মায়ের করুণ বিলাপে কেঁপে উঠল ধানমন্ডির আকাশ-বাতাস। মুহূর্তে শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল মর্মান্তিক এই দুঃসংবাদ। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালকে বাসা থেকে গুম করেছে পাকিস্তানে সরকার। শহর থেকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল ইথারে ইথারে। বিশ্ববাসী জেনে গেল, পাকিস্তান সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালকে বাসা থেকে গুম করেছে তারা।

ফজিলাতুন নেছা শোকে যেন পাথর হয়ে গেলেন এবার। এতদিন স্বামী আর জ্যেষ্ঠপুত্র কামালের কথা ভেবে কাতর হয়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর সঙ্গে যোগ হলো দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালের চিন্তা। বুকটা যেন তাঁর ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে অব্যক্ত ব্যথাভারে।

ছয়

জয়ের আগমনে পরিবারে যে হাসি-আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল জামালের অন্তর্ধানে হঠাৎ যেন তা মরাগাঙে পরিণত হলো। সবাই কেমন চুপচাপ গম্ভীর! বাড়িতে প্রাণের সাড়া নেই কোনো। মা-ই জাগিয়ে রাখেন বাড়ির সবাইকে, মা-ই পরিবারের প্রাণ। সেই মা-ই যদি নির্বাক হয়ে যান, অন্যরা ভাষা পাবে কোথায়? সবাই গুটিয়ে গেল ভীষণ।

এরমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খবর জানা গেল এক দমকা। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে তাঁকে। বিশেষ ট্রাইবুনালে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর ফাঁসির রায় হতে পারে। ফজিলাতুন নেছার কাছে মরার ওপর যেন খাঁড়ার ঘা এই খবর। ভীষণ মুষড়ে পড়লেন তিনি।

এর পাশাপাশি আরেকটি খবর যেন কিছুটা সুবাতাস নিয়ে এল সবার মনে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধে সবরকম সহযোগিতা দিচ্ছে ভারত সরকার। বাংলাদেশের তরুণ যুবারা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে সীমান্ত এলাকা দিয়ে দলে দলে দেশে আসছে। এসব তরুণ-যুবাদের বলা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা। এই খবর প্রচণ্ড নাড়া দিলো ফজিলাতুন নেছাকে। হঠাৎ কেমন এক আশার আলো দেখতে পেলেন তিনি। বাহ্, এই যুবাদের দলে আমার কামালও আছে নিশ্চয়ই। জামালও কি তবে গোপনে ট্রেনিং নিতে ভারতে পাড়ি জমিয়েছে? ভেতরে ভেতরে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন তিনি। যুদ্ধ হোক, এই মুহূর্তে যুদ্ধই শ্রেয়। যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেলে বিশেষ ট্রাইবুনালে বঙ্গবন্ধুর বিচারের বিরুদ্ধে নিশ্চয় বিশ্বনেতারা সোচ্চার হবে। বিচার বাতিলও হয়ে যেতে পারে।

সত্যি তা-ই হলো। ক্রমেই সব দৃশ্যপট যেন পালটে যেতে লাগল দিনে দিনে। খবর পাওয়া যাচ্ছে, মুক্তিবাহিনীর যুবারা যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে আসছে ঢাকার দিকে। ঢাকার আকাশে বিমান চলাচল বেড়ে গেল হঠাৎ। সকাল-দুপুর-বিকেল হঠাৎ হঠাৎ আকাশে চক্কর দিচ্ছে বিমান। ডিসেম্বরের ১৪ ও ১৫ দুটি দিন যেন বিমানের কসরত দেখে দেখে ও শব্দ শুনে শুনেই কেটে গেল ঢাকাবাসীর। ১৬ তারিখ এল মহালগ্ন। বিকেলের দিকে শহরময় রটে গেল বহু কাঙ্ক্ষিত সেই সংবাদ– বাংলাদেশ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। পাকিস্তানিরা পরাজয় মেনে নিয়েছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন।

কিন্তু ধানমন্ডি ১৮ নম্বর (বর্তমান ৯/এ) রোডের ২৬ নম্বর বাড়ির পাকিস্তানি দ্বাররক্ষী সিপাহিদের কানে বাঙালির বিজয়বার্তা পৌঁছাল না। ১৭ই ডিসেম্বর সকালেও তারা মারাত্মক খুনের মেজাজে দায়িত্বরত। সকালেই বাড়ির সামনের রাস্তায় গাড়িতে এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করল তারা। সাংবাদিক এসেছিল বন্দি বঙ্গবন্ধু পরিবারের খবর সংগ্রহ করতে। এই হত্যাকাণ্ডের খানিক পরেই বঙ্গবন্ধু পরিবারকে উদ্ধার করার জন্য একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় সেখানে হাজির হলেন ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্য মেজর অশোক তারা। তখনও মাথার উপর হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। অশোক তারা দেখলেন, পাকিস্তানি দ্বাররক্ষী সেনাদের কোনো হেলদোল নেই। বরং একজন সেন্ট্রি তার বন্দুকের মাথায় লাগানো ধারালো বেয়নেট অশোক তারার গায়ে ঠেকিয়ে ধরল। তিনি বুঝে গেলেন, এই সেনারা পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের খবর জানে না। তিনি বললেন, আমি ইন্ডিয়ান আর্মির একজন অফিসার। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় এখানে কেন চলে এলাম বুঝতে পারছ না? মাথার উপরের হেলিকপ্টারের চক্কর দেখে তো তোমাদের বুঝে ফেলা উচিত ছিল, সব খেলা চুকে গেছে। ঢাকার নিয়ন্ত্রণ এখন ভারতীয় মিত্রবাহিনীর হাতে, মুক্তিবাহিনীর হাতে। এখনও সময় আছে, সারেন্ডার করলে তোমরা অক্ষত শরীরে তোমাদের হেডকোয়ার্টারে ফেরত যেতে পারবে, আর না করলে তোমাদের লাশের কী হবে তার গ্যারান্টি নেই।

অগত্যা অশোক তারার গায়ে তাক করা বেয়নেট নামিয়ে নিলো পাকিস্তানিরা। আত্মসমর্পণের কায়দায় দাঁড়িয়ে গেল।

বঙ্গবন্ধু পরিবারের কয়েকজন আত্মীয় তখন উপস্থিত হয়েছে সেখানে। বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই মমিনুল হক খোকা তাঁদের একজন। তাঁদের দেখতে পেয়ে রাসেলের হাত ধরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন ফজিলাতুন নেছা। আহ্, কতদিন পর বাড়ির বাইরে এলেন তিনি! কতদিন পর দেখছেন মুক্ত আকাশ! কতদিন পর মুক্ত বায়ুর স্বাদ পেলেন!

অশোক তারা দেখলেন, বাড়ির ছাদের উপর পাকিস্তানি পতাকা উড়ছে। মমিনুল হক খোকা কোত্থেকে যেন ঝটপট বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এলেন একটি। অশোক তারা পাকিস্তানি পতাকাটি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে উড়িয়ে দিলেন বাংলাদেশের পতাকা।

ফজিলাতুন নেছা পাকিস্তানি পতাকাটি পায়ের তলায় পিষে চিৎকার করে বললেন, জয় বাংলা। তাঁর পেছন দিকে তখন কন্যা শেখ রেহানা আর শেখ হাসিনা এসে দাঁড়িয়েছে। শেখ হাসিনার কোলে উঁকি দিচ্ছে ছোট্ট জয়, আগামীর বাংলাদেশ।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

সৎ পথে উপার্জন
গড়ে দেবে শুদ্ধজীবন

ভুলিনি আমরা হে পিতা

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

তুমি আমাদের পথ দেখিয়েছ
ঠিকানা দিয়েছ মুক্তির
আমরা রেখেছি মর্যাদা সেই
সাতই মার্চের উক্তির।
তুমি শোনালে অভয়ের বাণী
মুছে ফেলে তাই জীবনের গ্লানি
নির্ভীক সেনা হয়েছি আমরা
সাহসে হয়েছি নিরাপোশ
শত্রুর সাথে করতে জানে না
কোনোদিন কোনো বীর আপোশ।
প্রাণ ঝরিয়েছি আপোশ করিনি
মৃত্যু জেনেও পেছনে সরিনি
তোমার সাহসে বলীয়ান হয়ে
করেছি যুদ্ধ; হারিনি
জয় করে দেশ তোমার প্রতি
হয়েছি আমরা যা ঋণী!
সেই ঋণভার নয় ভুলবার
ভুলিনি আমরা হে পিতা
আজকে যখন প্রশ্ন তোলে
বাঙালি জাতির কে পিতা?
তখন আমরা সজোরে জানাই–
শেখ মুজিবুর রহমান
বাঙালি জাতির পিতা হয়ে আজও
হৃদয়ে হৃদয়ে বহমান।

বঙ্গবন্ধু

আলম নজরুল

পাখির গানে-ঢেউয়ের তানে-ঝড়-বাদল আর বানে
মাটির প্রাণে-ফুলের ঘ্রাণে-কিংবা পাকা ধানে
মিশে আছে নামটি তোমার গভীর মায়ার টানে।
তোমার নামে শহর-গ্রামে কিংবা ধরাধামে
ডাইনে-বামে-রক্ত-ঘামে কিংবা সকল কামে
ফুটছে কত আগুনের ফুল রাত্রি-দিবস-যামে।

মুজিবুর প্রিয়

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

টুঙ্গিপাড়ার বাইগার নদী
মধুমতী গিয়ে মিশে,
মুজিবুর নাম ধ্বনিত হয়
দোয়েলের শিসে শিসে!
পদ্মা মেঘনা যমুনায় মেশে মাটি মানুষের সাড়া
মুজিবুর এই বাঙালির চির স্রোত বহমান ধারা।
মেঘে মেঘে বেলা কাটে সারাবেলা
জুড়ে আছে ঘন ঘোর,
মুজিবুর মানে সকলেই জানে
সাহসী স্রোতের তোড়!
সুরে-আহ্বানে সাহসের গানে সততায় মাথা তোলা
বাংলা-বাঙালির মুজিবুর প্রিয় স্বাধীনতা প্রাণ খোলা।

তোমাকে না জানলে

ইজামুল হক

মানুষকে ভালোবেসে
কী করে নিজেকে ভুলে থাকা যায়–
তোমাকে না জানলে
কস্মিনকালেও এ কথা
জানবে না কেউ।

মানুষকে ভালোবেসে
খুব সহজেই হারানো যায়–
খেলার মাঠ, ডুবসাঁতারের
বাঘিয়ার জল; জীবন মাতানো
যৌবন, স্বজনের হাসিমাখা মুখ
বর্ষার জল, বসন্ত বাতাস
এমনকি
ছোট্ট এ জীবনের চার হাজার ছয়শত বিরাশি দিন
তোমাকে না জানলে
কস্মিনকালেও এ কথা
জানা হবে কি কারও?

মানুষকে ভালোবেসে
হিমালয় ছুঁতে পারে কেউ–
তোমাকে না জানলে
কস্মিনকালেও এ কথা
জানতো কি কেউ?

মানুষকে ভালোবেসে
মৃত্যুকেও ভালোবাসা যায়
মরেও জীবিত থাকে হাজার বছর
তোমাকে না জানলে–
কস্মিনকালেও এ কথা
জানবে কি কেউ?

বেদনা বেহাগ

দেবকী মল্লিক

বিষাদ ভরা আগস্টের এই গহীন রাতে,
কোন অজানায় হারিয়ে গেলে গো সব ফেলে!
বিয়োগ-ব্যথায় গভীর শোকে কাঁদছে মানুষ,
আনন্দে আর ওড়ায় না কেউ সেই যে ফানুস!

অরুণ রাগে যেদিন তুমি ফুটিয়েছিলে এই ধরণী,
হাসির ছটায় মুক্তো ঝরিয়ে দুলেছিল বন-বনানী।
তোমার বিচ্ছেদ-ব্যথায় আজি চারদিক হাহাকার,
তবুও তোমার বজ্রকণ্ঠ সাধ্যি নেই কারও থামাবার।
আজিও সে নিনাদ উঠিছে আকাশ-বাতাস ফুঁড়ি,
নিনাদ আমেজে তাই নাচিছে বাংলার ফুলকুঁড়ি।

তোমার হৃদয়ে লালিত স্বপ্নমাখা অবিশ্বাসের 'পদ্মা সেতু'--
এপার-ওপার দুপাড়জুড়ে বিশ্ব দেখে 'ধূমকেতু'।

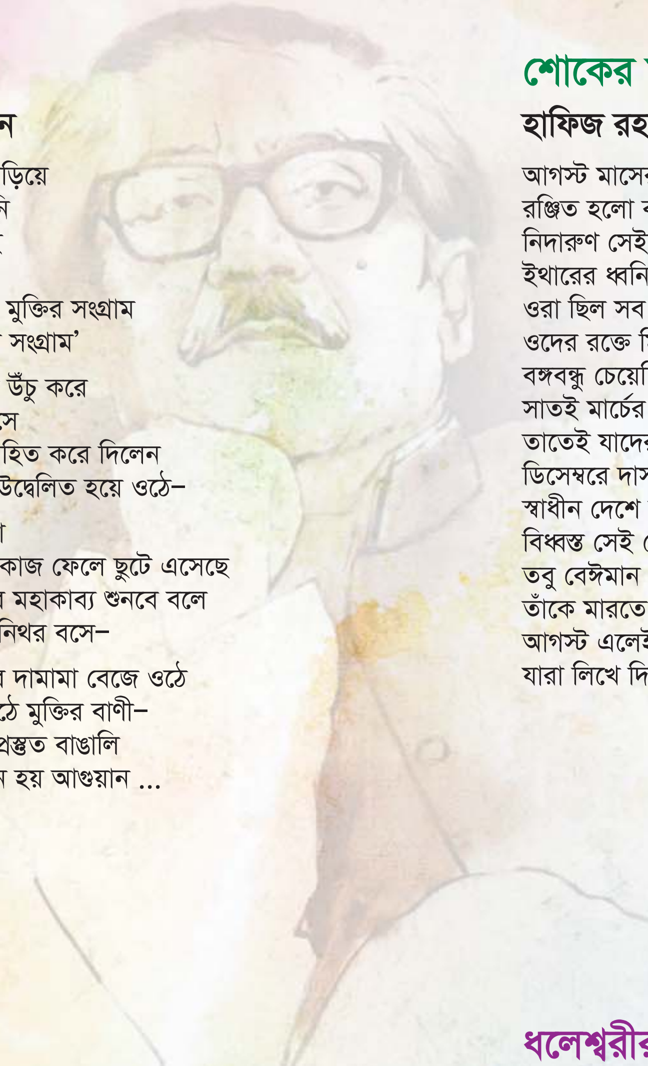

মহাকাব্য

শাহাদত হোসেন সুজন

দীপ্ত পায়ে সবুজ গালিচা মাড়িয়ে
জনতার সম্মুখে এলেন তিনি
শেখালেন না অ আ ক খ ই
শোনালেন বজ্রকণ্ঠ বাণী–
‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’

শোনালেন মহাকাব্য তর্জনী উঁচু করে
বুক ভরা তেজ অসীম সাহসে
বাঙালির ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত করে দিলেন
বাঙালি বেঁচে থাকার স্বপ্নে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে–

কৃষক যুবা আবালবৃদ্ধবনিতা
কামার কুমার তাঁতি জেলে কাজ ফেলে ছুটে এসেছে
শতাব্দীর মহানায়কের অমর মহাকাব্য শুনবে বলে
উন্মুখ জনতা খাঁ খাঁ রোদে নিথর বসে–

মাঠ ঘাট প্রান্তরে মুক্তিযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে
দেশময় বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে মুক্তির বাণী–
কাঁস্তে হাতুরি শাবল হাতে প্রস্তুত বাঙালি
যুদ্ধে যাবে বলে সম্মুখ পানে হয় আগুয়ান ...

ফিরে এসো

ফয়সল আহমেদ

এই বাংলায় এসো তুমি– আবার এসো ফিরে
ফিরে এসো লাল-সবুজে মধুমতীর তীরে
ফিরে এসো মিছিলে তুমি পথ কাঁপবে আজ
ফিরব আবার সংগ্রামে পরবো রণসাজ

স্লোগান দিবে শেখ রাসেল– মিছিল হবে ঝাঁঝালো
গুঞ্জন হবে বাতাসজুড়ে রাজপথ কে কাঁপালো?
মিছিল হবে রক্তডোবা– মিছিল পাবে পূর্ণতা
ঘুচে যাবে দুঃখগুলো– ঘুচবে সকল শূন্যতা।

প্রতিশোধ হবে প্রতিরোধ হবে জয় বাংলা–
জয় বলে
স্বাধীনতার স্বপ্নপথিক আমরা সবাই একদলে
রণভেরী বাজবে আবার বাংলার শিবিরে
নতুন যুগের মুক্তিসেনা তৈরি আলো আঁধারে।

ধানমন্ডি ৩২ হবে সবার বাড়ি মিছিল শেষে ফেরা
বঙ্গমাতার মমতায় থাকবে আলোয় এ ঘর ঘেরা
শেখ হাসিনা শেখ রেহানা দিশারি বাংলার
মুজিব সবার মাথার মুকুট বিশ্বের অহংকার।

শোকের মাস

হাফিজ রহমান

আগস্ট মাসের পনেরো তারিখ বঙ্গবন্ধুর রক্তে
রঞ্জিত হলো বাংলার মাটি, কাঁদলো লক্ষ ভক্তে।
নিদারুণ সেই রাতের বেলা হায়েনার উল্লাসে
ইথারের ধ্বনি শুনেছি সেদিন মধ্যরাতে ভাসে।
ওরা ছিল সব পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের সৃষ্টি
ওদের রক্তে মিশেছিল সেই পাকিস্তানি কৃষ্টি।
বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তি,
সাতই মার্চের ভাষণে যেন স্বাধীনতার উক্তি।
তাতেই যাদের গাত্রদাহ তারা তো ছোবল মারবে
ডিসেম্বরে দাসখত দিলেও সুযোগ কি আর ছাড়বে?
স্বাধীন দেশে ফিরেই তিনি ছুটেছেন দিবারাত্র,
বিধ্বস্ত সেই দেশের জন্য নিয়ে সাহায্য পাত্র।
তবু বেঈমান দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক খুনির দল
তাঁকে মারতে কত কলকাঠি ষড়যন্ত্রের কত জাল
আগস্ট এলেই মনে পড়ে যায় তাদের সেসব মুখ
যারা লিখে দিল বাংলা মায়ের আজীবনের শোক।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি

মিয়াজান কবীর

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি দুষ্টুমিতে ভারি,
উথাল নদী পাড়ি দিতে শুধু আড়িধাড়ি।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি জলে সাঁতার কাটে,
এপাড় থেকে ওপাড়ে যায় আবার আসে ঘাটে।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি সারা দুপুরবেলা,
জোয়ার জলে খেলা করে– ভাসায় কলারভেলা।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি উথাল-পাথাল জলে
বাইচের নৌকায় বৈঠা হাতে ‘হেইও হেইও’ বলে।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি লগি-বৈঠা ঠেলে,
দূর-দিগন্তে যায় হারিয়ে গাঁয়ের পথটি ফেলে।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি বন্ধু-মিতা পেলে
ঘোলাজলে ডুবে ডুবে ‘অইল ডুবডুব’ খেলে।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি জলে ছুটে ত্বরা,
খেলার ছলে সাঁতার কাটে-কাটে জলের ছড়া।

ধলেশ্বরীর সেই ছেলেটি দেখতে মনোহারী,
ডুবসাঁতারে উজান স্রোতে জমায় পাড়ে পাড়ি।

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে মাতৃদুগ্ধ

সাবিহা শিমুল

মাতৃস্নেহ এবং মাতৃদুগ্ধ প্রত্যেকটি সুস্থ শিশুর বেড়ে ওঠার পরিপূরক। শিশুরা যাতে সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে এক্ষেত্রে মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। মায়ের দুধ প্রত্যেকটি শিশুর অধিকার। মায়ের দুধ খেলে শিশুর শারীরিক বুদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মায়ের দুধ যে প্রত্যেক শিশুর জন্য অতি জরুরি এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার। বিশ্বের সকলেই যেন শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ান একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত সেই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'দ্য ওয়ার্ল্ড এলায়েন্স ফর ব্রেস্টফিডিং অ্যাকশন-এর উদ্যোগে এবং ইউনিসেফের সমর্থনে ১৯৯২ সাল থেকে ১লা আগস্ট থেকে ৭ই আগস্ট পর্যন্ত পালন করা হয় 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। বিশ্ব নিরাপদ মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০২২-এর প্রতিপাদ্য– 'স্টেপ আপ ফর ব্রেস্ট ফিডিং: এডুকেট অ্যান্ড সাপোর্ট'। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই শিশুর স্তন্যপানকে এগিয়ে নিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্বের ১৭০টি দেশে মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হয়ে থাকে। মায়ের দুধ শিশুর জন্য আর্দশ খাবার যা শিশুর দেহের সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণকে কমিয়ে দেয়। যে শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে তার পরিপূর্ণভাবে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে থাকে। শুধু তাই নয়, মাতৃদুগ্ধ পানের ফলে মা ও তার শিশুর মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সর্ম্পক স্থাপিত হয়। জন্মের পর পরই শিশুকে মায়ের দুগ্ধপান করানো আবশ্যক, এতে শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি কমে যায়। এবং মায়েদের স্তন ও ডিম্বাশয় ক্যানসারের ঝুঁকি কমে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু বা নবজাতককে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করানো হয় তাদের মৃত্যুর হার ৩১ শতাংশ কমে যায়। এতে শিশুমৃত্যু হার হ্রাস পায়।

মায়ের দুধে শিশুর প্রয়োজনীয় সব ধরনের পুষ্টি উপাদান সঠিক মাত্রায় থাকে। তাছাড়া মায়ের দুধে আছে শতকরা ৯০ ভাগ পানি। সেজন্য ছয় মাস বয়স পর্যন্ত আলাদা পানি পান করতে দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।

মায়ের দুধের অ্যান্টিবডি শিশুর জন্য প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। নবজাতক শিশুর দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকর করে তোলে। শিশুকে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, শ্বাসনালীর রোগ, হাঁপানি, অ্যালার্জি প্রভৃতি রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখে। দাঁত ও মাড়ির রোগ থেকে শিশুকে কার্যকরভাবে রক্ষা করে। মায়ের দুধে পূর্ণমাত্রায় ভিটামিন 'এ' থাকে বলে তা শিশুর অস্থির রোগ রিকেট প্রতিরোধ করে। এছাড়া শিশু অসুস্থ হলেও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। মায়ের দুধ পান শিশুর ক্যানসার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি ভয়াবহ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। মানসিক বিকাশেও মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু গুঁড়া দুধ খায় তাদের তুলনায় মায়ের দুধ যারা খায় তাদের বুদ্ধির বিকাশ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকার কারণে এটি শিশুর মস্তিষ্ক বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পান মা ও শিশুর আত্মিক বন্ধন দৃঢ় করে।

একটি সুস্থ শিশু পরিবারের পাশাপাশি সমাজ থেকেও বোঝা কমায়। তাই বেঁচে থাকায় এবং শিশুর সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো গুরুত্বপূর্ণ। অতএব দীর্ঘমেয়াদে বুকের দুধ খাওয়ানো জাতির জন্য একটি সুস্থ শিশু গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বিশ্বব্যাপী শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর হার এখনও অনেক কম। বাংলাদেশে জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর হার ৬৯ শতাংশ। মাত্র ৬৫ শতাংশ ক্ষেত্রে শিশুকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ পান করানো হয়। তাই স্তন্যপান করানোর উপকারিতার ব্যাপারে সবাইকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে। এ হার আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প–২০২১ ও রূপকল্প–২০৪১-এর মাধ্যমে সরকার দেশকে এমন জায়গায় নিতে চায়, যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিক উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারে। এলক্ষ্যে বর্তমান সরকার মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীতকরণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্রেস্টফিডিং কর্নার স্থাপন করা, কর্মজীবী মায়েদের ভাতা প্রদান, ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন, বিনামূল্যে মাতৃত্ব সেবাদান ও শিশুর সুস্থ জীবনের জন্য টিকা ও ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মা ও শিশুমৃত্যু হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

নতুন প্রজন্মকে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আমরা একটি কর্মক্ষম জাতি ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। তাই জন্মের পরপরই শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মায়ের দুধ পান নিশ্চিত করা শুধু সরকার নয়, আমাদের সকলের দায়িত্ব। মাতৃদুগ্ধ পান নিশ্চিত করার সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিবারের সব সদস্যের শিক্ষা ও সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। প্রসূতি মায়ের পরিবারকে স্তন্যপানের উপকারিতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পাশাপাশি প্রসূতি মা যেন সুস্থভাবে স্তন্যপান করাতে পারেন, সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন হতে হবে। এসব বিষয় নিশ্চিত করতে পারলেই নবজাতকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং আমরা একটি মেধাবী ও সুস্থ জাতি উপহার হিসেবে পাবো।

সাবিহা শিমুল: প্রাবন্ধিক

ধানমন্ডি ৩২: রাজনৈতিক ও পারিবারিক আবহে উপন্যাসের শিল্প বিস্তার

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

ত্রিশ পেরুনো লেখক শামস সাইদের ব্রেইনচাইল্ড জাতির পিতার জীবনীভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের একটি দীর্ঘ উপন্যাস *ধানমন্ডি ৩২*। লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জেনেছিলাম এই আখ্যান ছয় খণ্ডে শেষ হবে। এখন পর্যন্ত প্রায় তেরোশো পৃষ্ঠার দুটি খণ্ড আমাদের হাতে এসেছে। বাকি চার খণ্ডের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছি। হয়ত খুব সহসাই পাঠকের হাতে পৌঁছবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ এখন পর্যন্ত প্রায় চার সহস্রাধিক। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় অর্থাৎ কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, ছড়ায়, গান, নাটকে ও প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য লেখা হলেও এখনও সব গ্রন্থিত হয়নি। তবে জাতির পিতাকে নিয়ে গ্রন্থকাররা যুগ যুগ ধরেই লিখবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একজন নেতাকে নিয়ে এত বেশি গ্রন্থ রচিত হওয়ার ঘটনা হয়ত সারা বিশ্বে বাংলাদেশই এই কৃতিত্বের দাবি করতে পারে।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য গল্প রচিত হলেও বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক অর্থাৎ সরাসরি প্রধান চরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়ে কয়েকটি উপন্যাস এখন পর্যন্ত রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, উপন্যাস দীর্ঘ সময় ও পরিশ্রমের ফসল। তাই উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি আশা করাও ঠিক নয়। অদ্যাবধি যেসব উপন্যাস হয়েছে সেগুলো হলো– সেলিনা হোসেনের *আগস্টের একরাত*, *৭ই মার্চের বিকেল*; আব্দুল মান্নান সরকারের দুই খণ্ডে *জনক*, মহিবুল আলমের *তালপাতার পুঁথি*, মোস্তফা কামালের তিন খণ্ডে *অগ্নিপুরুষ*, *অগ্নিকন্যা*, *অগ্নিমানুষ*; আনিসুল হকের *যারা ভোর এনেছিল*, *উষার দুয়ারে*, *আলো-আঁধারের যাত্রী*; আউয়াল চৌধুরীর *সেই কালো রাত*; হুমায়ুন মালিকের *মুজিবপুরাণ*; মাশরুর আরেফিনের *আগস্ট আবছায়া*; সমীর আহমেদের *দাওয়াল* এবং সিরাজুল ইসলাম মুনীরের *এক সাগর রক্তের বিনিময়ে*, *পূর্ব পশ্চিম*; সৈয়দ শামসুল হকের *দুধের গেলাসে নীল মাছি* এবং বর্তমান নিবন্ধ লেখকের উপন্যাস *মায়াবী দৌলত*। *মায়াবী দৌলত* উপন্যাসে 'মুজিব কোট' একটি চরিত্র চিত্রিত হয়ে মুজিব-আদর্শের প্রতিনিধি হিসেবে কাহিনির বাতাবরণে বঙ্গবন্ধুর বিমূর্ত ও প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির মাধ্যমে যেন দেহের অভ্যন্তরে থাকা হৃৎস্পন্দনের মতো সারা উপন্যাসে প্রাণসঞ্চার করে। কিশোর উপযোগী উপন্যাস রচিত যেগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি রয়েছে; যেমন- আহমেদ রিয়াজের *লাহোর টু গোপালগঞ্জ*, *টুঙ্গিপাড়ার খোকা* এবং শামস সাইদের *বত্রিশের সবুজ পাতা*।

উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস

তরুণ কথাসাহিত্যিক শামস সাইদ বক্ষ্যমাণ উপন্যাসটি নির্মাণ করতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম ত্যাগ করেছেন তা বলার প্রয়োজন নেই, বইটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেই যে-কোনো পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাহিনি বিন্যাসে তিনি দুটি অধ্যায়ে অভিনবত্বের স্বাক্ষর রাখলেও পরবর্তী সময় প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রচলিত ধারা যুক্ত করে দুই খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটান। এতে কাহিনির কোনো ব্যত্যয় বা ত্রুটিবিচ্যুতি হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

প্রথম খণ্ডের শিরোনাম *ধানমন্ডি ৩২ নম্বর*, দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম *ধানমন্ডি ৩২ নম্বর* করা হলেও *গণ-অভ্যুত্থান পর্ব* লেখাটি উপ-শিরোনাম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দুই খণ্ড মিলে প্রায় তেরোশো পৃষ্ঠায় বিস্তৃত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। প্রথম খণ্ডে মোট ৩৯টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৪টি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে কয়েকটি করে পরিচ্ছেদ। উভয় খণ্ডে অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু যে সাধারণ মানুষের কত প্রিয় ও শ্রদ্ধার নেতা ছিলেন তা বোঝানোর জন্যই হয়ত লেখক প্রথম খণ্ডের অধ্যায়টি শুরু করেন পাগল সেকান্দারের ঢাকার বত্রিশ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আগমনের বর্ণনা দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পঁচিশ বছর পর সেকান্দার ঢাকায় আসেন যার পুটলার ভেতরে বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি সযত্নে সে পঁচিশ বছর ধরে আগলে রেখেছে। যেহেতু সেকান্দার মানসিক রোগী তাই পথে পথে তাকে পড়তে হয়েছে নানা বিড়ম্বনায় এবং শেষ পর্যন্ত হেঁটে সে ঢাকায় এসে পৌঁছায়। সেকান্দার পাগল হলেও তাকে বদ্ধপাগল বলা যায় না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের শোক সহ্য করতে না পেরে তার মানসিক বিকৃতি ঘটেছে এবং এ কারণেই বঙ্গবন্ধুর ছবিটিকে আগলে রেখেছে। এই সেকান্দার বঙ্গবন্ধুকে একবার দেখেছিল কৈশোরে আর তখন থেকেই তার মননে বঙ্গবন্ধু এক দেবতুল্য নেতা। সেকান্দার এমনই একজন সাধারণ মানুষ যে টুঙ্গিপাড়া এলাকা থেকে বত্রিশ নম্বরের বাড়িটি দেখার জন্য তিন দিন হেঁটে এসেছে ঢাকায়। পাগল বলে তাকে কোনো বাসে তোলা হয়নি। এই অধ্যায়েই লেখক আরও বেশ কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা করেন, যারা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের আমৃত্যু সঙ্গী ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আরও একটি বিস্ময়কর চরিত্রকে সন্নিবেশিত করেছেন লেখক। তার নাম রুহুল আমিন। তিনি ভুসিমালের ব্যাবসা করতেন বলে তাঁকে রুহুল আমিন ভুসি ডাকা হতো। একবার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রুহুল আমিনের দেখা হলে বঙ্গবন্ধু তাকে আদর করে ভুসি ডেকেছিলেন। সেই থেকে তিনিও প্রিয় নেতার এই ডাকটিকে হৃদয়ে ধারণ করেন। এই উপন্যাসের অর্থাৎ বত্রিশ নম্বরের কাহিনি নির্মিত হয় মূলত রুহুল আমিনকে গল্প শোনানোর মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে মুহিতুল রুহুল আমিন ভুসিকে লেকের পাশে

বসে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ির গল্প শোনান, যে বাড়িটি এক সময় বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের ঠিকানা, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার এবং বাঙালি জাতির ভরসা ও আশ্রয়স্থল ছিল।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় থেকে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বসবাস ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বত্রিশ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ির নির্মাণ ইতিহাস এবং এই বাড়িকে ঘিরে বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিখুঁত বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। ধীরে ধীরে চিত্রিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও ঐ বাড়িকে ঘিরে ইতিহাসের আলোচিত রাজনীতিকদের সংগ্রামী জীবন।

ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িটি এই দীর্ঘ উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক চরিত্র। যদিও একটি বাড়িকেন্দ্রিক উপন্যাস তথাপি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে দুটি খণ্ড রচিত হয়েছে এবং ১৯৬৯ সালের ২৩শে জানুয়ারির তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর জনসভার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু যখন কোর্ট স্ট্রিটের বাসায় থাকেন সে বছরই তাঁর পরিবার ঢাকায় চলে আসেন এবং বঙ্গবন্ধুর ফুফাতো ভাই মমিনুল হক খোকার ৮/৩ রজনী বোস লেনের বাসার দোতলায় ওঠেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে মমিনুল হক খোকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ফুফাতো ভাই হলেও বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার জন্য গাড়ি চালাতেন, দেশের বিভিন্ন জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেতেন, পরিবারের লোকজনকে নিয়ে জেল গেটে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে যেতেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তিনিই মূলত দায়িত্বশীল অভিভাবক হিসেবে পরিবারের দেখভাল করতেন, কাজ করতেন (পঁচাত্তরের মর্মান্তিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরও তিনি শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার অভিভাবক হিসেবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন)। মূলত মমিনুল হক খোকার বাসা থেকেই ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবনের যাত্রা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে বত্রিশ নম্বর সড়কের কাহিনির দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক পথচলা কতটা বন্ধুর ও বিপদসংকুল ছিল তার বর্ণনা এখান থেকেই শুরু হয়।

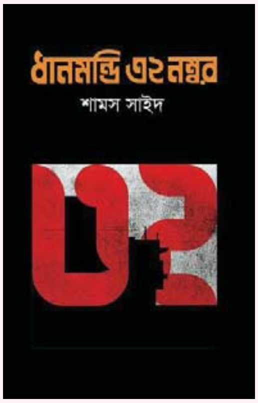

বঙ্গবন্ধু প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক, পরে সম্পাদক এবং শেষে সভাপতির পদ লাভ করেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাঁর অক্লান্ত কর্মতৎপরতা, গতিশীল নেতৃত্ব এবং নির্যাতিত-বঞ্চিত গণমানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়াতে তিনি ক্রমেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় নেতা হয়ে ওঠেন। তবে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল মুসলিম লীগ এবং মুসলিম লীগের নেতারা রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন ধর্মকে। আওয়ামী লীগ বা বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করলে ধর্ম থাকবে না বলে তাদের প্রধান অস্ত্র ব্যবহার করত যা স্বাধীনতার-পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি একই অপপ্রচার চালিয়ে আসছে আওয়ামী লীগের বিরোধী নেতারা।

আইয়ুব খানের নির্যাতনের মুখ্য সহযোগী হলেন খুলনার সবুর খান ও কিশোরগঞ্জের মোনেম খান। মোনেম খান তখন গভর্নর এবং সবুর খান পাকিস্তানের যোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন। তাদের দুজনের ষড়যন্ত্রের কারণেই বঙ্গবন্ধুকে দিনের পর দিন কারাগারে থাকতে হয়েছে। এই খণ্ডে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অন্যান্য নেতার পরিচয় হওয়ার ঘটনাগুলোও উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড শেষ হয় যশোর আদালতের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর, সেখানে কয়েক শত আইনজীবী, অসংখ্য নেতাকর্মী-জনতার ভালোবাসায় সিক্ত হওয়ার দৃশ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় খণ্ডটি শুরু হয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আগাগোড়া কাহিনি, সেই সময়কার বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন, পারিবারিক জীবন, দেশের আন্দোলনের গতিবিধি এবং গণজাগরণের ঘটনাবলি দিয়ে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যার সরকারি নথি অনুযায়ী শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা'। এই মামলাটিই মূলত বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের একটি টার্নিং-পয়েন্ট এবং আইয়ুব খান ও মোনেম খানের শাসনের অবসান হয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অধিকাংশ আসামি ছিলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য (২৬ জন) এবং বঙ্গবন্ধুর নাম পরে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঔপন্যাসিক এই খণ্ডে বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের উদ্বিগ্নতা দিয়ে শুরু করেন। ঐ মামলার এক নম্বর আসামি বঙ্গবন্ধু এবং দুই নম্বর আসামি ছিলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। মোয়াজ্জেম হোসেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসেন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় এই মামলায় বঙ্গবন্ধুকে অন্তর্ভুক্ত করার মূল ক্রীড়নক ছিলেন মোনেম খান ও সবুর খান। আইয়ুব খানকে অত্যন্ত কৌশলে ও ফাঁদে ফেলে বঙ্গবন্ধুকে আসামি করানোর জন্য এই দুইজন তাকে বাধ্য করেন। তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, শেখ মুজিবকে আসামি করা হলে মামলা টিকবে না। কিন্তু মোনেম খান ও সবুর খানের দুরভিসন্ধিতে হার মেনে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুকে আসামি করেন এবং শেষ পর্যন্ত মামলাটি আর টিকেনি।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরি করেন এভাবে:

> যশোর আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন মুজিব। এই খবর শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন মোনেম খান। কি বলে, জামিন পেয়েছেন মুজিব। তা কেমন করে। তিনি যে হেসেছিলেন, তার কি হবে। পুরোটা বিফলে যাবে? না, তা যেতে পারে না। এই অস্থিরতা নিয়ে ফোন করলেন সবুর খানকে। বললেন, তা ঘটনা এখন কেমন হয়ে গেল খান সাহেব। মুজিব গ্রেপ্তার হলেন। আটকে তো রাখতে পারলেন না। জামিন পেয়েছেন। এটা কেমন খেলা শুরু করলেন? আপনার খেলা তো বুঝতে পারছি না আমি।

সবুর খান ও মোনেম খান ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকেন একটার পর একটা এবং বঙ্গবন্ধুকে এক কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি দিয়ে আরেক কারাগারে পাঠানোর খেলা চালাতে থাকেন তারা। এদিকে বঙ্গবন্ধুর ওপর এমন পাশবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে থাকে এবং বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্যভাবে। লেখক দক্ষতার সঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামিকে উপন্যাসে সন্নিবেশিত করেছেন। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমের ওপর যে পৈশাচিক নির্যাতন হয়েছিল এবং মিথ্যে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য মেরে তাঁর দাঁতও ভেঙে দিয়েছিল তার বর্ণনাও পাওয়া যায়।

কারাগারই হয়ে ওঠে যেন বঙ্গবন্ধুর স্থায়ী বাসস্থান। পূর্বেই বলা

হয়েছে যে, উপন্যাসটি রাজনৈতিক ও পারিবারিক আবহে নির্মিত হয়েছে এবং লেখক সমান্তরালভাবে কখনো পারিবারিক জীবন ও কখনো বঙ্গবন্ধুর জেল ও রাজনৈতিক জীবন চিত্রিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকা অবস্থায় তাঁর প্রথম সন্তান ও আদরের কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিয়ে হয় বিজ্ঞানী ওয়াজেদ আলী মিয়ার সঙ্গে। বিয়ের প্রস্তাবসহ আনুষ্ঠানিকতার বর্ণনা উপন্যাসে অনেকটা জায়গাজুড়ে চিত্রিত করেছেন লেখক। আগরতলার মামলার বিচারের সময় কারা বিচারক ছিলেন, কারা প্রধান আইনজীবী ছিলেন, রাষ্ট্রপক্ষের উকিল কারা ছিলেন ইত্যাদির বিশদ বিবরণ এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। এই খণ্ডে বেগম মুজিবের দূরদর্শিতা, দেশপ্রেম, মাতৃত্ববোধ, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার যথার্থ দিকগুলো লেখক ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রিয় মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য মানুষ নিজের বিশ্বাসের কাছেও হার মানে। এরকম একটি বাস্তব ঘটনা লেখক উপন্যাসে স্থান দিতে ভুলে যাননি। যদিও বেগম মুজিব ও তাঁর পরিবার প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ ছিলেন তথাপি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য তিনি তান্ত্রিকের খবর পেয়ে মমিনুল হক খোকাকে নিয়ে তার কাছে যান।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন কমিটির (ডাক) কার্যক্রমে আওয়ামী লীগ অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যায়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা ঘোষিত হওয়ার রাজনীতির প্রেক্ষাপটও বদলে গেল রাতারাতি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন– ছয় দফা এমন কৌশলে প্রণীত হয়েছে যেখানে শেখ মুজিবকে সরাসরি দোষীও করা যাবে না, আবার মেনে নিলে পূর্ব পাকিস্তান এক সময় পৃথক রাষ্ট্র হওয়ার প্রক্রিয়াকে নিবৃত্তও করা যাবে না। মওলানা ভাসানীও নিজ দলের প্ল্যাটফর্ম থেকে গণজাগরণের জন্য সভা-সমাবেশ করতে শুরু করেন যদিও তিনি ছয় দফা মানেননি। রাজনীতির মাঠ ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে। জনগণ বুঝতে পারে তাদের মুক্তির জন্য শেখ মুজিবই একমাত্র নেতা। এরপর আন্দোলন আরও দানা বাঁধতে থাকে এবং ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি ইতিহাসের বড়ো ঘটনা 'গণ-অভ্যুত্থান' সংঘটিত হয়। গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাপে আইয়ুব শাহী আগরতলা মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় খণ্ডে অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং এটি পড়ার পর পাঠক পরিষ্কার ধারণা পাবেন যে, ষাটের দশকই ছিল মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট তৈরির মুখ্য সময়।

গণ-অভ্যুত্থানের পরের মাসে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি পান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিবকে গণ-সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কয়েক লক্ষ মানুষ ওই জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য, তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। ঐ জনসভাতেই তখনকার ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ মানপত্র পাঠের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন। উল্লেখ্য যে, জনসভায় ঘোষণার আগে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়ার ইতিহাসও জুড়ে দিয়েছেন লেখক। উপন্যাসটি শেষ হয় ঐ জনসভায় এক আবেগঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে। লেখকের ভাষায়:

> আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন মুজিব। তাকাতে পারছেন না তিনি সামনের জনসমুদ্রের দিকে। তাঁর চোখে জল। মনে পড়ল সেই স্যারের কথা। মুজিব মানুষের মতো মানুষ হতে পারলে তার জন্য আন্দোলন করে মানুষ। জীবন দেয়। স্যার আজ এসে দেখে যান, আপনার মুজিব মানুষ হয়েছে। তাঁর জন্য মানুষ আন্দোলন করে। জীবন দেয়। তারা আজ আপনার মুজিবকে বন্ধু করে নিয়েছে। উপাধি দিয়েছে বঙ্গবন্ধু।

দীর্ঘ উপন্যাস লেখা কষ্টসাধ্য কাজ। তদুপরি, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা আরও শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। কারণ, প্রথমে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসহ খুঁটিনাটি বিষয়কে আত্মস্থ করে উপন্যাস নির্মাণ করতে হয়। আবার ঔপন্যাসিককে লক্ষ রাখতে হয় যাতে সংবেদনশীল কোনো ঘটনাতে অপ্রাসঙ্গিক একটি শব্দও যেন মুদ্রিত না হয়। লেখক হিসেবে তার নিরপেক্ষতার দায়ও কম নয়। এতসব বিষয় মেনে নিয়েই ঐতিহাসিক ফিকশন লেখা একটি দুরূহ কাজ, যেটি তরুণ ঔপন্যাসিক শামস সাইদ সফলভাবে করতে পেরেছেন বলে আমাদের ধারণা।

দুই খণ্ডের উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে অন্বেষা প্রকাশন থেকে। দুটি খণ্ড আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ৬০০ টাকা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৫০ টাকা।

মোজাম্মেল হক নিয়োগী: কথাসাহিত্যিক

'আমাদের অর্থে আমাদের পদ্মা সেতু' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

'আমাদের অর্থে আমাদের পদ্মা সেতু' গ্রন্থটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উৎসর্গ করেছেন এ গ্রন্থের সম্পাদক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, কবিতা ও গান গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত দুইটি ভাষণ, বিশিষ্টজনদের লেখা ৫১টি প্রবন্ধ, ১০টি কবিতা ও ছড়া, ৩টি গান ও ৪টি সাক্ষাৎকার রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রন্থটির প্রকাশক, চন্দ্রাবতী একাডেমির স্বত্বাধিকারী কামরুজ্জামান খন্দকার কাজল। অনুষ্ঠানের শুরুতে পদ্মা সেতু বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে গ্রন্থটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখকগণ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন সম্পাদিত 'আমাদের অর্থে আমাদের পদ্মা সেতু' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ২৬শে জুলাই রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক, বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তায় বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের নানাদিক তুলে ধরে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বাংলাদেশের উন্নয়ন ইতিহাসে অনন্য এক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে তারা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক এই অর্জনের বিভিন্ন দিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লেখনির মাধ্যমে এ গ্রন্থে তুলে ধরার জন্য বক্তারা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

পাগল

আবুল কালাম আজাদ

১৫ই আগস্ট। ভোর ৬টা।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির সামনে জনসমুদ্র। উপস্থিত লোকদের হাতে ফুল, মনে পিতৃ হারানোর শোক। সবাই এসেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। অনেকেই এসেছে কোনো সংগঠনের ব্যানারে, অনেকে এসেছে একা অথবা বন্ধু, পরিবারপরিজন নিয়ে। সবাই এসেছে হৃদয়ের গভীর টানে।

বেলা যত বাড়ছে, জনসমাগম তত বাড়ছে। কিছুক্ষণ পরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা লোকজনকে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করছে। প্রধানমন্ত্রীর চলাচলের পথকে নির্বিঘ্ন করছে।

একটা মানুষ আজীবন দেশ আর দেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তিনি। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটে গেছে জেলজুলুম সয়ে। তাঁরই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই আহ্বানের পর মানুষ আর ঘরে থাকতে পারেনি। হাতিয়ারহীন পরাধীন মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিসংগ্রামে। হায়েনারূপি পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে বন্দি করে। কিন্তু এর আগেই ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পাকিস্তানিরা তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। তাঁর ওপর চালাতে থাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন। কিন্তু হিমালয়সম কঠিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শত নির্যাতনে, ভয়-ভীতিতে তিল পরিমাণ টলেননি। তিনি অবিচল থেকেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবিতে। দেশের মানুষও মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে শপথ নিয়েছে, দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে, পাষাণ খাঁচা ভেঙে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তারা যুদ্ধ করে গেছে অসীম সাহসিকতায়। প্রতিবেশী দেশ ভারত, পরাশক্তি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ আরও অনেক দেশ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পেয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও সমর্থন। আওয়ামী লীগ নেতারা গড়ে তুলেছেন প্রবাসী সরকার। এই সরকার একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেছে, তেমন অর্থ তহবিলের ব্যবস্থা করে মুক্তিযোদ্ধাদের বেতন-ভাতা, খাদ্য, অস্ত্র ও ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। নয় মাসের মরণপণ লড়াইয়ের পর পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় শিকার করতে বাধ্য হয়েছে। যুদ্ধের শেষদিকে ভারতীয় বাহিনীও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যৌথ বাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণের কাছে শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি পাকিস্তানি হায়েনারা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে 'বাংলাদেশ' নামে আরও একটি দেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি লন্ডন হয়ে দেশের মটিতে পা রাখেন। কোটি জনতা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায়। আনন্দাশ্রুতে ভেসে যায় তাঁর বুক। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত সফলতা– যার নাম 'বাংলাদেশ'।

আর দশটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের চেয়েও বিধ্বস্ত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। পাকিস্তানি হায়েনারূপী সেনারা শুধু নির্বিচারে মানুষই হত্যা করেনি, লুণ্ঠন, জ্বালাও-পোড়াও এবং নিরীহ মা-বোনদের ধর্ষণ করেছে অবলীলায়। গেরস্থের যত্নে লালিত গরু-ছাগল, কৃষকবধূর হাঁস-মুরগি, কৃষকের কষ্টের ফসল কিছুই রেহাই পায়নি হায়েনাদের হাত থেকে। দেশের কলকারখানা, রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট সবই ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত। তার ওপর ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের কথা তো সবারই জানা।

ধ্বংসস্তূপসম একটি দেশকে গড়ে তোলার সুকঠিন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। চোর, লুটেরা এরকম মানুষ খুবলে খেতে চাচ্ছিল নবজাতক দেশটাকে। বিশ্বাসঘাতক চাটুকাররা ঘিরে ধরেছিল সরলপ্রাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছিল পুরোদমে। সেনাবাহিনীর ক্ষমতালোভী বিবেকহীন সদস্যদের জিভ বেয়ে টসটস করে ঝরে পড়ছিল ক্ষমতার লোভের লালা। তারা হয়ে উঠেছিল ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে গড়ে ওঠা জাসদ যুবসমাজের মগজ ধোলাই করে তাদেরকে দলে টানে। দেশব্যাপী নির্বিচারে খুন-গুম হয়ে ওঠে তাদের নিত্যদিনের কর্ম। আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী আন্তর্জাতিক মহলও থেমে ছিল না। তাদের ভালো করেই জানা ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থাকলে বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠবেন বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক নেতা, ইতোমধ্যে তিনি তা হয়ে উঠেছিলেনও। তাই কুচক্রী আন্তর্জাতিক মহলও নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়তে লাগল। তাদের এমন ধারণাও ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সরাতে পারলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করা যাবে। বঙ্গবন্ধু হত্যায় স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করতে না পারলেও তারা স্বাধীনতাবিরোধীদের ব্যাপক শক্তিমান করে তুলতে পেরেছিল। বিভিন্নভাবে তাদেরকে

দেশে প্রভাবশালী করতে পেরেছিল। একদিকে রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণকে অবারিত করে, অন্যদিকে চাকরি, ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় তাদেরকে সুযোগ দিয়ে তাদের অবস্থানকে সুসংহত করে, যার নেতিবাচক ফল জাতি আজও ভোগ করছে।

সব মিলিয়ে তৈরি হলো একটা রক্তাক্ত ১৫ই আগস্ট। সেদিন নিষ্পাপ ছোট্ট শিশুটিও রক্ষা পায়নি কাপুরুষ ঘাতকের বুলেট থেকে।

১৫ই আগস্ট প্রতিবছর আসে। বাঙালির হৃদয় খুড়ে পিতৃ হারানোর শোক জাগ্রত করে।

রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে লেকের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল একটা লোক। হাতে কয়েকটা ফুল। তাজা ফুল নয়। কুড়িয়ে পাওয়া শুকনো নেতিয়ে পড়া ফুল। লোকটা বড়ো চোখে তাকিয়ে আছে ৩২ নম্বরের বাড়ির দিকে।

তবে লোকটাকে এখন আর কেউ মানুষের মধ্যে গণনা করবে না। তার নেই কোনো জাতীয় সনদপত্র, কিংবা ভোটাধিকার। একমুখ দাড়িগোঁফ, জটপরা চুলে তার উকুনের পরিপাটি সংসার। চোখের কোণে পিচুটি। নোংড়া পোশাক। দৃষ্টিতে বিস্ময়। সবাই তাকে বলে পাগল।

উপস্থিত লোকজনের ভেতর থেকে একজন বললেন, সেও ফুল দেবে নাকি?

আরেকজন বললেন, পাগল হলেও বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসার বোধটুকু ধরে রেখেছে।

আরেকজন বললেন, এর আগেও দুই/এক বার ১৫ই আগস্টে তাকে দেখেছি। সেকি প্রতি ১৫ই আগস্টেই এখানে আসে?

একজন চোখে-মুখে মহাবিস্ময় নিয়ে বললেন, বলেন কী! এর আগেও তাকে দেখেছেন?

– হু, দেখেছি।

– কোনো রহস্য আছে নিশ্চয়। একজন বদ্ধ পাগল এভাবে ফুল হাতে ৩২ নম্বরের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ?

পাগল লোকটাকে ঘিরে এরকম বিক্ষিপ্ত কথাবার্তার সময় সেখানে আরেকজন লোক এলেন। লোকটা পোশাক-আশাকে পরিপাটি, চেহারায় উচ্চশিক্ষার ছাপ। পদস্থ মনে হয়। লোকটা থমকে দাঁড়ালেন। সরাসরি বড়ো চোখ করে পাগলটার দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টি স্থির। তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছু মুহূর্ত। তারপর এগিয়ে গেলেন পাগলটার দিকে। এতক্ষণ যারা পাগলটাকে নিয়ে এটা-ওটা কথা বলছিলেন তারা মহাবিস্ময়ে পতিত। ভদ্রলোক এভাবে পাগলের কাছে যাচ্ছেন কেন!

আরও কয়েক মিনিট নিরীক্ষণ করে ভদ্রলোক পাগলকে বললেন, শরিফুল তুই! তুই বেঁচে আছিস? আমি তোকে চিনতে পেরেছি। আমার এতটুকু ভুল হয়নি।

উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, তাকে চেনেন?

– হ্যাঁ চিনি। ও আমার বন্ধু ছিল। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এক সঙ্গে পড়তাম।

– এমনটি হলো কী করে?

– সে এক করুণ ইতিহাস।

– কী রকম করুণ ? প্লিজ, একটু খুলে বলবেন?

– ১৯৭৫ সালে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। সারারাত আমরা বিভিন্ন প্রস্তুতি কাজে কাটিয়েছি। সকালে খবর পেলাম কিছু পথভ্রষ্ট, ক্ষমতালোভী, নরপশু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। ১৫ই আগস্ট রাত ৯টায় আমরা টিএসসিতে প্রতিবাদ মিছিল বের করি। সেই মিছিলে শরিফুলও ছিল। তারপর স্বাধীনতাবিরোধীরা ভীষণভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা কিছু দিনের জন্য যার যার গ্রামে চলে যাই। এক সময় আমরা ফিরে আসি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু শরিফুল ফেরে না। আমি ওর গ্রামের ঠিকানায় বেশ কয়েকটা চিঠি লিখি। কোনো উত্তর পাই না। শেষে খোঁজ নেওয়ার জন্য একদিন আমি ওর গ্রামের বাড়ি যাই। গিয়ে যা জানলাম ...।

লোকটার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। উপস্থিত সবার ভেতর তখন শেষটুকু জানার তুমুল আগ্রহ।

একজন বললেন, গিয়ে কী জানলেন?

– শরিফুলের বাবা ছিলেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি একটা হাত হারিয়েছিলেন, একটা পা ছিল অকেজো। যুদ্ধবিরোধীদের নিদারুণ আক্রোশ ছিল তার ওপর। তার কারণেই এলাকার রাজাকার বাহিনী, পাকিস্তানি আর্মিরা একাধিক সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর স্বাধীনতাবিরোধীরা প্রথমে শরিফুলদের বাড়ির সম্পদ, টাকা-পয়সা লুট করে, তারপর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। শরিফুলের বাবা-মাকে হত্যা করে। ওর একমাত্র বোনটাকে ধরে নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর খুনিরা শিশু রাসেলকেও বাঁচতে দেয়নি, কিন্তু ওরা অজ্ঞাত কারণে শরিফুলকে বাঁচিয়ে রাখে। শরিফুল কয়েকদিন শূন্য ভিটায় স্তব্ধ বসে থাকে। প্রতিবেশীরা কেউ কেউ জোর করে কিছু খাওয়ায়। তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। গ্রামের লোকজন মনে করেছিল, শরিফুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছে। আমরাও ওর ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু না। শরিফুল আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরেনি। শেষে আমরা ধরে নেই, সেইসব পশুরা পরে শরিফুলকেও হত্যা করেছে।

লোকটা চোখ মুছতে থাকেন। উপস্থিত লোকজনের কারও কারও চোখে জল। সবার মুখে বেদনার ছায়া।

ভদ্রলোক বললেন, শরিফুলকে যখন পেলামই, আমি ওকে আর হারাতে দেব না। আমি ওকে উপযুক্ত চিকিৎসা করাবো। আমি ওকে সুস্থ করে তুলব। ও হয়ত জানে না, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। ও হয়ত জানে না যে, এই দেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং তাদের উপযুক্ত সাজা হয়েছে। ও নিশ্চয় জানে না, ইনডেমনিটি নামের কলঙ্ক মুছে গেছে এবং বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার হয়েছে, অনেকেই উপযুক্ত সাজা পেয়ে গেছে। এসব জানলে শরিফুল অনেক খুশি হবে, ওর সব হারানোর বেদনা কিছুটা হলেও লাঘব হবে। আমি ওকে সুস্থ করে তুলব। এসব ওকে জানতে হবে। যদি ওর বোনটা বেঁচে থাকে তো তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

এমন সময় সাইরেন বেজে উঠল। প্রধানমন্ত্রী আসছেন। শরিফুলের মুখও কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দুর্নীতিকে না বলুন

না করলে দুর্নীতি
হবে দেশের উন্নতি

কোনো দিন পারবে না

আবু জাফর আবদুল্লাহ

বিমর্ষ কুয়াশায় যেদিন আমরা
পরস্পর বিদায় নিলাম।
'আর দেখা হবে না', কেন জানি
এ কথা মনেই আসেনি।
মানুষতো আশার আলোয় স্নাত প্রাণী।
নিরাশার অন্ধকারে যেতেই চায় না
কখনো সে।
অথচ দিনরাত্রির ভালোবাসার
মতো দুঃখ-বেদনা, আশা-নিরাশা
যেন জোড়া শব্দ থাকে অহরহ
জীবন ঘিরে।
এই এখন কোথায় তুমি?
রাত্রির নিথর নিস্তব্ধতায় আমি
এখন বিচলিত।
ঘুম আসছে না।
ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে কে আমাকে
ঘুম পাড়াবে? সেই ছোট্টবেলায়
মা আমার এ কাজটি করতেন।

আমিতো এখন তাঁর নাগালের বাইরে।
তোমার নাগালে।
অথচ তুমি আবার আমার নাগালের বাইরে।
এত যে বাইরে, আমার অনুভব
তোমাকে স্পর্শ করতে পারছে না
কত বাইরে তুমি?

ভাঙার শব্দে তোলপাড়

ইসলাম জবা

বৃষ্টি জলের প্রতি ফোঁটায়
উঁকি মারে পতনের শব্দ
প্রতিটি রোমের গোড়ায় গোপন ছোঁয়া
লেগে আছে জলকণা।

অস্থির ঝড়ো হাওয়া ঢেউ তোলে মনে।

জলের প্রতি ফোঁটায় উঁকিঝুঁকি
পুরুষশার্দূল শরীর
পায়ের শব্দে মেঘের গর্জন
ভেঙে দাও মনের কাঁচের চুড়ি টুংটাং।

ভাঙনের শব্দে তোলপাড়
পাড় ভাঙে মন, পাড় ভাঙে পরস্পর।

মন হারাবার পর

অদ্বৈত মারুত

বিষণ্ন রোদ্দুর চোখে স্থির হয়ে আছে
ফুরিয়ে গিয়েছে কবেই শিশিরের ঘ্রাণ;
পায়ে পায়ে পথচলা গ্রামীণ সড়ক।
বড়ো বেশি আবেগী হাওয়া নদীতে আজ
কাঁধের ব্যথায় কোঁকড়াচ্ছে সীমানা প্রাচীর!

হাপরে দুপুর ঘুমিয়ে গিয়ে জেগে উঠেছিল
মরা পাতায়; দুরাশায় কেঁদেছিল আকাশে–
বান করে নিয়ে যাবে ঘর, সব গোরস্থান!

ভাঙছে– মাটি সরে যাচ্ছে গৃহসম্ভারের
নাবালিকা প্রেমে ডুবে ভেসে যেতে যেতে–
একদিন পাখিগুলোর কান্না শুনতে শুনতে
একদিন টিউবওয়েলের মাথা খুলতে খুলতে

মনে হয়েছে
নিজের মাথাটা নিজের সঙ্গেই নাই!

বৃষ্টিবিলাস

ওয়াসীম হক

সুখে থাকো আমার শহর নকশিকাঁথায় মুড়ে
যন্ত্রণা থাক লুকোছাপায় কষ্ট শরীরজুড়ে,
কেউ দেখো না মানসপটে উলটো পিঠের ছবি
খাতায় শুধু সুখই এঁকো নগর মানস কবি।

চায়ের কাপে আমেজ নিয়ে ব্যালকনিতে তুমি
ভেজা শহর গাছের সবুজ ভেজা পটভূমি,
ফুটপাতের ওই পলিথিনে ছিদ্রগুলো গোনা
কী দরকারি মন খারাপের কাব্য তোমার শোনা।

সুখী মানুষ এসো তবে পদ্যে ভেজাই পাতা
বৃষ্টিবিলাস জটিল ভারী দিয়ে মাথায় ছাতা।

নারীর নাম নদী

রনি অধিকারী

এই পথ মিশে যায় নদী জল অথৈ সমুদ্দুর
সূর্যালোকে জলস্তম্ভ যেন এক পাহাড় প্রাচীর।
প্রশ্নের শাসন ভাঙে অতঃপর ছুটে চলে ভয়
তবু ভয়ে বুক কাঁপে কেন যেন মানে না শাসন।
সব কিছু মনে হয় পড়ে আছে অজ্ঞাত আড়ালে
অচেনা বাতাস ছোঁয় সাঁই সাঁই শরীরের ভাঁজ...
মায়াবী চোখের জলে জন্ম নেয় অপলক নদী
জলকষ্ট জলমেয়ে আহারে নারীর নাম নদী।

ছড়াগুচ্ছ

পনেরো আগস্ট মধ্যরাতে

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

পনেরো আগস্ট মধ্যরাতে
শেষ শ্রাবণের বৃষ্টিপাতে
ছড়ার কলম খাতা হাতে
শেখ মুজিবুর ভিজে,
এসে তিনি আমার দ্বারে
কড়া নাড়েন বারে বারে
দরজা খুলে দেখে তারে
অবাক হলাম নিজে!

বসে তিনি আমার কাছে
বলেন, কিছু কথা আছে
তোমার ছড়ায় হৃদয় নাচে
চেতন জাগে মনে,
বলুক লোকে আজেবাজে
মুগ্ধ আমি তোমার কাজে
জেগে উঠি ঘুমের মাঝে
পিতার কথা শুনে।

বাংলাদেশের বুক

মোহাম্মদ অংকন

আগস্ট মাস, পনেরো তারিখ
আমার ভীষণ শোক
কাঁদতে চাই না, কান্না আসে
ভিজে ওঠে চোখ।

ভেজা চোখে চেয়ে দেখি
শেখ মুজিবের মুখ
বিস্মিত হই, শেখ মুজিব নয়
বাংলাদেশের বুক।

বাংলার বুকে বিশাল ছবি
সবুজের বুকে লাল
শেখ মুজিবের সোনার বাংলা
জাগ্রত চিরকাল।

বাংলাদেশের বুকের ভেতর
গুলি চালায় কারা?
শোকের মাসে জানতে চাই
দেশ ছেড়েছে তারা?

লাল-সবুজের হৃদয়জুড়ে

শাকিব হুসাইন

মুজিব আছে
স্বাধীন দেশের
স্বাধীন নদীর ঘাটে
মুজিব আছে বীর জনতার
রেসকোর্সের মাঠে।

মুজিব আছে
মধুমতীর
ছোট্ট ডিঙি নায়ে
মুজিব আছে সবুজ-শ্যামল
টুঙ্গিপাড়া গাঁয়ে।

মুজিব আছে
দূর আকাশে
চাঁদ তারাদের দেশে
মুজিব আছে মায়ের কোলে
রাজকুমারের বেশে।

মুজিব আছে
ভোরের পাখির
মধুর সুরে সুরে
মুজিব আছে লাল-সবুজের
একটি হৃদয়জুড়ে।

সেই ছেলেটি

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

সেই ছেলেটি কই আছে ভাই
সেই ছেলেটি কই?
যাঁর আঙুলে জাদু ছিল
কথায় মুগ্ধ হই।
সেই ছেলেটি বঙ্গবন্ধু
টুঙ্গিপাড়া গাঁয়
লক্ষকোটি ভক্ত তারে
ভুলিতে না পায়।
সেই ছেলেটির দরদি মন
কাটত সেবায় বেশ
তার-ই ত্যাগের বিনিময়ে
পেলাম স্বাধীন দেশ।
সেই ছেলেটি শেখ মুজিবুর
জাতির পিতা আজ
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি
বাঙালিদের তাজ।
সেই ছেলেটি বসত এখন
সবার-ই অন্তরে
আর রয়েছে বাংলা মায়ের
প্রতি ঘরে ঘরে।

সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জনকল্যাণে সরকার গৃহীত নীতি-কৌশল প্রণয়নে এবং সেগুলো বাস্তবায়নে দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।' এজন্য সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে। জনগণ যাতে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সরকারি সেবাসহ সকল ন্যায্য অধিকার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ২৩শে জুলাই 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের হাতে ২০শে জুলাই ২০২২ বঙ্গভবনে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রতিবেদন তুলে দেন 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকার গৃহীত রূপকল্প–২০২১-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছেছে, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করেছে, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর ন্যায় মেগা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বোপরি সরকারের সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে করোনা অতিমারির সময়েও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত স্বাভাবিক ধারায় ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল অর্জনে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণের সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সেবা প্রদানের মানসিকতার উপর এ সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এর সম্ভাবনাসমূহ জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে নিজেদের সক্ষমতা উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে হবে।

আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অপরিসীম

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, 'মাছে-ভাতে বাঙালি'– এ শাশ্বত পরিচয়েই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে মৎস্য খাতের গুরুত্ব। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে মৎস্য সেক্টরের ভূমিকা অপরিসীম। ২৪শে জুলাই 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এবারের জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য– 'নিরাপদ মাছে ভরব দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকার মৎস্য খাতের অপার সম্ভাবনা ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে এর উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মৎস্য খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মৎস্য চাষকে যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণের মাধ্যমে খামারের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির ছোটো মাছসহ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্য রক্ষায় উন্মুক্ত জলাশয়ের পরিবেশ উন্নয়নসহ জলজ দূষণ রোধকল্পে আরও কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষিতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, কৃষিতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে শস্যের বহুমুখীকরণ ও ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, কৃষি আধুনিকীকরণ, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণবিদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ২৭শে জুলাই 'কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) ২০২০' সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের মূল বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা রাখছেন কৃষিবিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, কৃষক, উৎপাদনকারী ও কৃষি সংগঠকরা।

এদের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এআইপি হিসেবে নির্বাচিতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া কৃষি ক্ষেত্রে একটি অনন্য সংযোজন। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, কৃষিতে বাংলাদেশের দৃশ্যমান এ সাফল্যের সূচনা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে। স্বাধীনতার পরপরই তিনি কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করেন। তাঁর দেওয়া প্রথম ডেভেলপমেন্ট বাজেটের ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকাই ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই বর্তমান সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

ভবন নির্মাণে ক্রস ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই জুলাই গণভবনে দেশের অটিজম ও এনডিডি শিশুদের শিক্ষার ন্যায্য ও সমঅধিকার নিশ্চিতকল্পে নির্মিতব্য আন্তর্জাতিকমানের একটি 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটিজ (এনএএএনডি) কমপ্লেক্স'-এর নকশা উপস্থাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মেধা, মনন বিকাশে সমন্বিত শিক্ষার পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া যে-কোনো স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় এ ধরনের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে খোলামেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এলক্ষ্যে শহর এলাকায় যে-কোনো আবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'ক্রস ভেন্টিলেশন' ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অটিজম ও এনডিডি শিশুদের জন্য বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং নতুন নতুন শিক্ষক সৃষ্টির ওপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া ভবনের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি দিনের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার, মুক্ত বায়ু/অক্সিজেন চলাচল, প্রয়োজনীয় জলাধার সংরক্ষণ, যথাযথ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান রাখার ওপর জোর দেন।

মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে সাধারণ নাগরিক এবং মন্ত্রিসভার সদস্যসহ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সকলকে বিদ্যুৎ ব্যবহারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দেন। ১৯শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একনেক সভায় যুক্ত হয়ে এ পরামর্শ দেন।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদ্‌যাপন ও জাতীয় মৎস্য পদক ২০২২ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২' উদ্‌যাপন ও 'জাতীয় মৎস্য পদক ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 'নিরাপদ মাছে ভরব দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'– শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশে ২৩ থেকে ২৯শে জুলাই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মাছের কোনো অভাব হবে না এবং নতুন রপ্তানি আইটেম যুক্ত করতে সক্ষম হব। যাদের জলাধার আছে তারা যেন সেই জলাধারকে মাছ চাষের আওতায় আনার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে খাদ্য ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের ওপর জোর দেন এবং তরুণ প্রজন্মকে এলক্ষ্যে এগিয়ে আমার আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক মৎস্য খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় মৎস্য পদক ২০২২ প্রদান করেন।

ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২৩শে জুলাই 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে পদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

সাক্ষ্য আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুলাই গণভবন থেকে এবং মন্ত্রীরা সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি মন্ত্রিসভার বৈঠকে যুক্ত হন। বৈঠকে সাক্ষ্য আইনের (সংশোধন) খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। আইনের খসড়া অনুযায়ী ভিকটিমকে চারিত্রিক বিষয়ে প্রশ্ন করতে হলে আগে আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে জুলাই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপজেলা পর্যায়ে ২৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করেন। গণভবন থেকে

ভার্চুয়ালি উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তিনি বিদেশগামীদের সতর্ক করেন এবং দালালদের খপ্পরে পড়ে সোনার হরিণ ধরতে ভিটেমাটি বিক্রি করে বিদেশ না যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে যাওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

করোনার মধ্যেও বাংলাদেশে দারিদ্র্য কমেছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলনে করোনার মধ্যেও বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে । ১৮ই জুলাই সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী গত ১৪ই এপ্রিল প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-রিকভারি অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স অ্যামিড গ্লোবাল আনসারটেইনটি' শিরোনামে প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে বলেন, সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, করোনা পরিস্থিতিতেও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ১১ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে– যা ২০২০ অর্থবছরে ছিল ১২ দশমিক ৫ শতাংশ।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বাংলাদেশে অতি দারিদ্র্যের হার ১০ দশমিক ৫ শতাংশ এবং দারিদ্র্য হার ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ এই করোনা মহামারির মধ্যেও সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সে সমস্ত কারণে মানুষের মাথাপিছু আয় যেমন বেড়েছে একইসাথে দারিদ্র্যের হার কমেছে –এটি আমাদের বক্তব্য নয়, এটি বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য। সম্প্রতি প্রকাশিত আইএমএফ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জিডিপির নিরিখে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৪১তম অর্থনীতির দেশ আর পিপিপিতে আমাদের অর্থনীতির অবস্থান আরও ওপরে ।

সরকার এগুচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৩ই জুলাই *বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা* ২১০০ পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মুহা. সাইফুল্লাহ, ডিএফপির পরিচালক মোহাম্মদ আলী প্রমুখ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পুস্তিকাটি সম্পর্কে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সরকার শুধু স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে তা নয়, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে দেশকে গড়ে তুলতে চান। সেজন্য সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ, ২০৪১ সাল নাগাদ পরিকল্পনা, ২১০০ সাল নাগাদ বদ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে লোকসংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১৯ কোটির মতো। তবে ২১০০ সাল নাগাদ দেশে লোকসংখ্যা কমে ১৫ কোটির কাছাকাছিতে দাঁড়াবে–এমনটিই বলছে পরিসংখ্যান।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. মকবুল হোসেন পুস্তিকাটি প্রকাশের জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। এসময় পুস্তিকাটিকে ইংরেজিতে প্রকাশের জন্য ডিএফপিকে অনুরোধ জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে টেকসইভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বদ্বীপ পরিকল্পনা–২১০০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পুস্তিকাটি এই বৃহৎ পরিকল্পনাকে মানুষের সামনে সহজভাবে উপস্থাপন করতে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

স্বাধীনতার সাথে প্রয়োজন দায়িত্বশীলতা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সংবাদপত্রের বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেমন অবশ্যই দরকার, তেমনি দায়িত্বশীলতারও প্রয়োজন। ৫ই জুলাই রাজধানীর কাকরাইলে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ মিলনায়তনে সাংবাদিকদের মাঝে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণ অনুদান ও করোনাকালীন ২য় পর্যায়ের আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১৩ই জুলাই ২০২২ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে অপসাংবাদিকতার জন্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, ইউকেতে এ ধরনের সংবাদ পরিবেশনের জন্য শুধু প্রশ্নের মুখোমুখিই হতে হয় তা নয়, সেখানে নিয়মিত জরিমানা দিতে হয়, যা আমাদের দেশে হয় না। সমালোচনা থাকবে, কারণ দায়িত্বে থাকলে সমালোচনা হবেই। যে দায়িত্বে নাই তার সমালোচনা করার সুযোগও নাই। কিন্তু সমালোচনাটা যেন বস্তুনিষ্ঠ হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আজকে সাংবাদিক সমাজের একটি ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ট্রাস্ট থেকে সহায়তায় সবাইকে বিবেচনা করা হয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকায় ডি-৮ সিসিআই বিজনেস ফোরামের উদ্‌বোধন

ডি-৮ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডি-৮ সিসিআই) প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে 'ডি-৮ সিসিআই বিজনেস ফোরাম অ্যান্ড এক্সপো' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জুলাই ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ডি-৮-এর ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং ডি-৮ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ২০তম অধিবেশনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

২৬শে জুলাই উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, বর্তমানে বৈশ্বিক খাদ্য সংকট চলছে। এ সংকট মোকাবিলায় ডি-৮ দেশগুলোর মধ্যে কৃষি খাতের টেকসই প্রযুক্তি বিনিময় করা যেতে পারে। এই জোটের দেশগুলোর সংস্কৃতি প্রায় কাছাকাছি, ধর্মও একই। রয়েছে বিশাল কর্মক্ষম তরুণ জনগোষ্ঠী। একসঙ্গে কাজ করলে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সব দেশই লাভবান হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারি সহায়তার পাশাপাশি ডি-৮ দেশগুলোর ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে নিজেদের মধ্যে অভিন্ন স্বার্থ ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে হবে। বাড়াতে হবে ব্যবসায়ীদের মধ্যকার যোগাযোগ।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ডি-৮ মিনিস্ট্রিয়ালের চেয়ারম্যান এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) ও ২৮টি হাইটেক পার্ক হচ্ছে। এখানে বিনিয়োগ করলে ভালো রিটার্ন পাওয়া যাবে। কর অব্যাহতিরও সুবিধা রয়েছে। ডি-৮ দেশগুলো চাইলে প্রয়োজনে তাদের জন্য আলাদা ইজেড করা হবে।

বাংলাদেশ ও কেনিয়ার মধ্যে দুই এমওইউ স্বাক্ষর

ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ ও কেনিয়া দুটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করে। ২৪শে জুলাই অনুষ্ঠিত এ বৈঠক শেষে চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়। এমওইউগুলোর একটি নিয়মিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বৈঠক (ফরেন অফিস কনসালটেশন, সংক্ষেপে এফওসি) প্রসঙ্গে। অন্যটি দুই দেশের কূটনীতিকদের দক্ষতা উন্নয়নে উভয় দেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে।

বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ও কেনিয়ার পক্ষে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (দ্বিপক্ষীয় ও রাজনৈতিক সম্পর্ক) মই লেমোশিরা এমওইউগুলো সই করেন। মই লেমোশিরা বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা কেনিয়ায় 'কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের' সুযোগ নিতে পারেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আগামী দিনগুলোতে আরও বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বৈশ্বিক সহযোগিতার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে করোনা মোকাবিলা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বৈশ্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হায়াশি ইয়োশিমাসা ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের যৌথ সভাপতিত্বে ১৯শে জুলাই ভার্চুয়ালি আয়োজিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান।

'কোভিড-১৯ গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যান' শীর্ষক বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যখন বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন, ঠিক সেসময় করোনা ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার ভীতি থেকে বিনিয়োগকারীরা এসব দেশ থেকে তহবিল সরিয়ে নিচ্ছেন। এতে উন্নয়নশীল দেশে তহবিল ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে। এসব দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে তিনি উন্নত দেশ এবং বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে রেয়াতি ঋণের প্রবাহ বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপরও জোর দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতু দিয়ে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এই প্রথম ঢাকা থেকে গার্মেন্টস পণ্য নিয়ে মোংলা বন্দর দিয়ে পোল্যান্ডের উদ্দেশে ছেড়ে গেছে বিদেশি জাহাজ এমভি মার্কস নেসান। ঢাকার ২৭টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ১৭টি কন্টেইনার পণ্য পদ্মা সেতু হয়ে মোংলা বন্দরে আসে। ২৫শে জুলাই থেকে সে সকল পণ্য জাহাজে বোঝাই করা হয়। বোঝাই শেষে পানাকা পতাকাবাহী জাহাজ এমভি মার্কস নেসান ২৮শে জুলাই পোল্যান্ডের উদ্দেশে মোংলা বন্দর ত্যাগ করে। বিদেশে জাহাজে রপ্তানি হওয়া এ গার্মেন্টস পণ্যের মধ্যে রয়েছে বাচ্চাদের পোশাক, জার্সি ও কার্ডিগান, টি-শার্ট, ট্রাউজারসহ বিভিন্ন পণ্য।

২৮শে জুলাই মোংলা বন্দরের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের পর এই প্রথম মোংলা বন্দর দিয়ে সরাসরি গার্মেন্টস পণ্য বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা থেকে দেশের সবচেয়ে নিকটতম বন্দর হচ্ছে মোংলা। ফলে বিভিন্ন আমদানি-রপ্তানিকারকরা এ বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। আগামীতে এ বন্দর দিয়ে গার্মেন্টস, কন্টেইনার, গাড়ি ও জেনারেল কার্গো হ্যান্ডেলিংয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর ঢাকা থেকে মোংলা বন্দরের দূরত্ব ১৭০ কিলোমিটার। আর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ২৬০ কিলোমিটার।

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশ ১০৪তম

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১০৪ তম। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা এখন আগাম ভিসা ছাড়া ৪১টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন। চলতি মাসে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনারস এই সূচক প্রকাশ করেছে। সূচকে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে ১০৪তম অবস্থানে রয়েছে কসোভো ও লিবিয়া।

শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে সবার শীর্ষে রয়েছে জাপান, দ্বিতীয় সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া, তৃতীয় জার্মানি ও স্পেন, চতুর্থ ফিনল্যান্ড, ইতালি ও লুক্সেমবার্গ, পঞ্চম অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন, ষষ্ঠ ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল ও যুক্তরাজ্য, সপ্তম বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র, অষ্টম অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেক রিপাবলিক, গ্রিস ও মাল্টা, নবম হাঙ্গেরি এবং দশম লিথুনিয়া, পোল্যান্ড ও স্লোভাকিয়া। শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে সবার নীচে রয়েছে আফগানিস্তান।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

প্রত্যেক নাগরিক ও গ্রামকে স্মার্ট করে গড়ে তোলা হবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের প্রত্যেক নাগরিক ও গ্রামকে স্মার্ট করে গড়ে তোলা হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উদ্ভাবনী, সাশ্রয়ী ও উন্নত স্মার্ট দেশে পরিণত করা হবে। ১৫ই জুলাই কক্সবাজারের উখিয়ায় একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এর আগে উখিয়ার রত্নাপালং ইউনিয়নে ডিজিটাল তুলাতুলি ভিলেজ কাম অ্যাগ্রিগেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন তিনি।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ৩০শে জুলাই ২০২২ ঢাকায় পর্যটন ভবনে বিভিন্ন মিডিয়ার রিপোর্টারদের মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করেন– পিআইডি

সভায় জানানো হয়, এফএওর ডিজিটাল ভিলেজ উদ্যোগ কৃষক, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তথ্য বিনিময় এবং জ্ঞান আদান-প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে। সেইসঙ্গে এটিকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। পাশাপাশি কৃষির আধুনিকীকরণ এবং আয় বৃদ্ধির জন্য এটি সবার কাজে আসবে। কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) মো. নাসিম আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

তরুণ-তরুণীরা ঘরে বসে ডলার উপার্জন করতে পারবে

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রায় ১৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে সিংড়ায় হাইটেক পার্ক স্থাপন সম্পন্ন হলে এই এলাকার তরুণ-তরুণীরা ঘরে বসে ইউরোপ-আমেরিকার মার্কেট প্লেসে কাজ করে ডলার উপার্জন করতে পারবে। ২৪শে জুলাই নাটোরের সিংড়ায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত আইটি হাইটেক পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। এসময় ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী উপস্থিত ছিলেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এই হাইটেক পার্কে থাকছে স্টিল স্ট্রাকচারের সাত তলা মাল্টিটেনেন্ট ভবন, তিনতলা ডরমেটরি ভবন, একটি সিনেপ্লেক্স ভবন, খেলার মাঠসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা। এসব স্থাপনার মাধ্যমে সিংড়ায় একটি চমৎকার ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা হবে। ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগের গতি বৃদ্ধি করবে এই 'হাইটেক পার্ক'।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পাচ্ছে ৭২টি প্রতিষ্ঠান

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি'র জন্য নির্বাচিত হয়েছে ৭২টি প্রতিষ্ঠান। ২৬শে জুলাই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়। সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে এবার তৈরি পোশাক (ওভেন) খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে রিফাত গার্মেন্টস লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে এ কে এম নিটওয়্যার লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে অনন্ত অ্যাপারেলস লিমিটেড। তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার) খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে জি এম এস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে স্কয়ার ফ্যাশনস এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে ফোর এইচ ফ্যাশনস লিমিটেড। এছাড়া সব ধরনের সুতা খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পাচ্ছে যথাক্রমে বাদশা টেক্সটাইল লিমিটেড, কামাল ইয়ার্ন লিমিটেড ও নাইস কটন লিমিটেড। অন্যদিকে, টেক্সটাইল ফেব্রিকস খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড। এ খাতে রৌপ্যপদক পাচ্ছে আকিজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড ও ব্রোঞ্জ পাচ্ছে নাইস ডেনিম মিলস লিমিটেড। হোম ও বিশেষায়িত টেক্সটাইল পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফেব্রিকস লিমিটেড। টেরিটাওয়েল খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে নোমান টেরিটাওয়েল মিলস লিমিটেড।

হিমায়িত খাদ্যপণ্য খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদকের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো যথাক্রমে জালালাবাদ ফ্রোজেন ফুডস লিমিটেড, এপেক্স ফুডস লিমিটেড ও এমইউ সি ফুডস লিমিটেড।

কাঁচা পাটপণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স।

পাটজাত দ্রব্যে স্বর্ণপদক পাচ্ছে আকিজ জুট মিলস লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড ও ব্রোঞ্জ পাচ্ছে ওহাব জুট মিলস লিমিটেড।

ক্রাস্ট বা ফিনিশড চামড়া পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে অ্যাপেক্স ট্যানারি লিমিটেড ও রৌপ্যপদক পাচ্ছে এস এ এফ ইন্ডাস্ট্রিজ। চামড়াজাত পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, রৌপ্যপদক এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে বিবিজে লেদার গুডস লিমিটেড। ফুটওয়্যার খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে বে-ফুটওয়্যার লিমিটেড, রৌপ্যপদক রয়েল ফুটওয়্যার লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে এফবি ফুটওয়্যার লিমিটেড।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত) খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে মনসুর জেনারেল ট্রেডিং লিমিটেড ও রৌপ্যপদক ইনডিগো করপোরেশন। কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য (তামাক ব্যতীত) খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে প্রাণ ডেইরি লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড ও ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে প্রাণ ফুডস লিমিটেড।

ফুল ফলিয়েজ ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ এবং রৌপ্যপদক পাচ্ছে এলিন ফুডস ট্রেড। হস্তশিল্পজাত পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে বিডি ক্রিয়েশন এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে ক্ল্যাসিক্যাল হ্যান্ডমেড প্রোডাক্ট বিডি।

প্লাস্টিক পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। সিরামিক শিল্প খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে আর্টিসান সিরামিকস লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে প্যারাগন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

হালকা প্রকৌশল খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে মেসার্স ইউনিগোরি সাইকেল কম্পোনেন্ট লিমিটেড ও রৌপ্যপদক পাচ্ছে মেসার্স ইউনিগোরি সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ইউনিট-২।

ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, রৌপ্যপদক কনফিডেন্স স্টিল লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে রহিমআফরোজ ব্যাটারি লিমিটেড। অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে তাসনিম কেমিক্যালস কমপ্লেক্স লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে মেরিন সেফটি সিস্টেম এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে মুমানু পলিয়েস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

ওষুধ পণ্যে স্বর্ণপদক পাচ্ছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ও ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড।

ইপিজেডভুক্ত শতভাগ বাংলাদেশি মালিকানাধীন ('সি' ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাকশিল্পে (নিট ও ওভেন) স্বর্ণপদক পাচ্ছে ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড ও রৌপ্যপদক পাচ্ছে প্যাসিফিক জিন্স লিমিটেড।

ইপিজেডভুক্ত শতভাগ বাংলাদেশি মালিকানাধীন ('সি' ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে ফারদিন এক্সেসরিজ লিমিটেড ও রৌপ্যপদক পাচ্ছে আর এম ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড। প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে এম অ্যান্ড ইউ প্যাকেজিং লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে মনট্রিমস লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে মেসার্স ইউনিগোরি পেপার অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যে স্বর্ণপদক পাচ্ছে অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, রৌপ্যপদক পাচ্ছে ইকো ফ্রেশ ইন্টারন্যাশনাল এবং ব্রোঞ্জপদক পাচ্ছে দ্য কনসোলিডেটেড টি অ্যান্ড ল্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড। অন্যান্য সেবা খাতে স্বর্ণপদক পাচ্ছে মীর টেলিকম লিমিটেড। নারী উদ্যোক্তা বা রপ্তানিকারকদের জন্য সংরক্ষিত খাতে (পণ্য ও সেবা) স্বর্ণপদক পাচ্ছে স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড, রৌপ্যপদক পাচ্ছে আল-সালাম ফেব্রিকস প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

নগদ-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি পাবে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হচ্ছে 'নগদ'। সরকারের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সফলতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ভাতা ও উপবৃত্তি বিতরণ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের কারিগরি ও মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ উপবৃত্তির অর্থ 'নগদ'-এর মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবে। এলক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, নগদ লিমিটেড ও বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নগদ-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে না। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে যে-কোনো নগদ উদ্যোক্তা পয়েন্টে গিয়ে উপবৃত্তির অর্থ বিনামূল্যে উঠাতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে জুলাই ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেন্টেনিয়াল টিটিসিসহ উপজেলা পর্যায়ে নির্মিত ২৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

এমপিওভুক্ত হয়েছে ২৭১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসা পর্যায়ে

আরও ২ হাজার ৭১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চুয়েট শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' উদ্‌বোধনকালে এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেন। পরে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি একই দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান। শিক্ষার মান, শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং পাসের হার ইত্যাদি বিবেচনা করে এই এমপিও ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এই এমপিওভুক্তি মিলে মোট এমপিও হওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দাঁড়ালো ২৯ হাজার ১৬৪টিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে সনদ দিতে প্রস্তুত অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা স্তরে পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সনদ দেবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। তবে শিক্ষায় 'গুণগত মান' না থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই সনদ পাবে না। নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে শর্তপূরণ করলে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হবে একটি স্কোর। ৭০ শতাংশ বা তার বেশি স্কোর পেলে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হবে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ। ২০শে জুলাই শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া উদ্‌বোধন করেন। এরপর থেকে সনদ পেতে আবেদন করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ অনুসরণ করে ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা ২০২১। এই বিধিমালা মেনেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেওয়া হবে অ্যাক্রেডিটেশন। বিধিমালা অনুযায়ী ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ স্কোর পেলে দেওয়া হবে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট। ৬০ শতাংশের কম নম্বর পেলে কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

কায়রোয় 'বাংলাদেশে ব্যাবসা ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

কায়রোয় বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত মিশরের শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ে 'বাংলাদেশে ব্যাবসা ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা' শীর্ষক এক বিজনেস সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে জুলাই মিশরের রামসিস হিলটন হোটেলে আয়োজিত সেমিনারে মিশরের বিভিন্ন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীগণ, টিভি চ্যানেল সংবাদকর্মী, মিশরে অবস্থানরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ীগণ, মিশর সরকারের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন। মিশরীয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরার অংশ হিসেবে দূতাবাস এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি মিশরের অ্যাপারেল এক্সপোর্ট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণ করে তার বক্তব্যে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা এবং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের চলমান ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও নীতি, প্রতিযোগিতামূলক শ্রম ব্যয় প্রভৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশ মিশরীয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল হতে পারে।

জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, উজবেকিস্তান বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। উজবেকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য ঢাকায় উজবেকিস্তানের একটি দূতাবাস স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যোগাযোগ সহজ করতে উভয় দেশের মধ্যে বিমান চলাচলের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করার জন্য একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে চলমান সমস্যাগুলো সমাধান করা হবে। ২৯শে জুলাই ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক তৃতীয় ইন্টারগভার্মেন্টাল কমিশনের সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

সভায় উজবেকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী Jamshid Khodjaev ২২ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে ১৫ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। সভায় দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিতে উভয় দেশ একমত পোষণ করে। এছাড়া দুদেশের মধ্যে যে সকল বাণিজ্য বাধা রয়েছে সেগুলো দূর করতেও উভয় দেশের সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভা শেষে উভয় দেশের মধ্যে এ তৃতীয় সভায় কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হয়।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

ওয়াসফিয়া এবার পা রাখলেন কে-টু পর্বতশৃঙ্গে

এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এবার পা রাখলেন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কে-টুর চূড়ায়। ২২শে জুলাই বার্তা সংস্থা *এএফপি* এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩৯ বছর বয়সি ওয়াসফিয়া ১৭ই জুলাই রাতে কে-টুর চূড়ায় ওঠার জন্য যাত্রা শুরু করেন। আর ২২শে জুলাই এর সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন। ওয়াসফিয়ার সাথে ইরানি আফসানেহ হেসামিফার্ড, লেবানিজ-সৌদি নাগরিক নেলি আক্তার ও পাকিস্তানের সামিনা বেগও এই চূড়া জয় করেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের প্রথম নারী পর্বতারোহী হিসেবে এই কে-টু জয় করেন। পাকিস্তানের কারাকোরাম পর্বতমালার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কে-টু।

দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভারতের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি দেশটির ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রথম নারী, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়ে ইতিহাস গড়লেন। ২৫শে জুলাই সংসদের কেন্দ্রীয় কক্ষে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান দেশটির প্রধান বিচারপতি এন ভি রমনা।

১৮ই জুলাই অনুষ্ঠিত ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির এনডিএ জোটের প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু বিপুল ভোটে জয়ী হন। ওড়িশার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এই নারী ভোট পেয়েছেন ৬৪.০৩ শতাংশ। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যশোবন্ত সিনহা পেয়েছেন ৩৫.৯৭ শতাংশ ভোট। ৬৪ বছর বয়সি দ্রৌপদী মুর্মু দেশটির কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রপতি যাঁর জন্ম স্বাধীন ভারতে।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতির শপথ

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। নাম কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন। ১লা জুলাই তিনি শপথ নেন। দেশটির ২৩৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো কৃষ্ণাঙ্গ নারী সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি হলেন। সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ার অবসর নেওয়ায় ৫১ বছর বয়সি জ্যাকসনকে সে জায়গায় মনোনয়ন দেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বোর্ড সভায় ৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা সহায়তার অনুমোদন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৮৮৩ জন শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের ৪ কোটি ৬৪ লাখ ১৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। ৩১শে জুলাই সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২৫তম বোর্ড সভায় এ সহায়তার অনুমোদন দেওয়া হয়।

সভায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত ৪৭ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৭৩ লাখ টাকা, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত ৮১২ জন শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ৩ কোটি ৮৪ লাখ ১০ হাজার টাকা, শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় ২৪ জনকে শিক্ষা সহায়তা হিসেবে ৭ লাখ ০৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে।

সভায় জানানো হয়েছে, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোর অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহত-আহত এবং নারায়ণগঞ্জে হাসেম ফুড লিমিটেডের অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহত-আহতসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের চিকিৎসায় ২৪৭ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে প্রদানকৃত ১ কোটি ৭৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা সহায়তার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেওয়া হয়। জরুরি ভিত্তিতে প্রদানকৃত ২৪৭ জন শ্রমিকের মধ্যে সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোর নিহত ২৮ জনসহ ২১৮ জন এবং নারায়ণগঞ্জের হাসেম ফুড কারখানার নিহত ৬ জন শ্রমিক রয়েছেন।

সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী অসহায় শ্রমিকদের কল্যাণে বছরান্তে লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ দশমিক ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদানের জন্য কোম্পানি মালিকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য মালিকদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কোম্পানির মালিকগণ যাতে এ তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান করেন তার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যন্ত এ তহবিলে ২৬৫টি কোম্পানি তাদের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত জমা দিচ্ছে। বর্তমানে এ তহবিলে স্থিতির পরিমাণ প্রায় ৭১০ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

৫০ বছরে চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চার গুণ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সার, বীজসহ কৃষি উপকরণে বিশাল ভর্তুকি, কৃষিযন্ত্রে ভর্তুকি, গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন কর্মসূচিসহ বহুমুখী উদ্যোগের ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বিগত ৫০ বছরে চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চার গুণ। ২০শে জুলাই রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে কনসাল্টেটিভ গ্রুপ ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চের (সিজিআইএআর) গবেষণা কার্যক্রমের পরিচিতি ও বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব নিয়ে সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এসময় বৈশ্বিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও জোরালো কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব সরকারের সময়োপযোগী ও কার্যকর উদ্যোগের ফলে দেশে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

ইউরোপসহ সারা বিশ্বে আম দ্রুত বাজারজাত

নেদারল্যান্ডসের আলমেয়ারে আন্তর্জাতিক হর্টিকালচার এক্সিবিশনে ৩রা জুলাই বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ দিবস পালিত হয়। এক্সিবিশনের মূল স্টেজে 'সেলিব্রেটিং বাংলাদেশ: ট্রান্সফরমিং এগ্রিকালচার' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্‌বোধন করা হয়। এতে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রদূত রিয়াজ হামিদুল্লাহ, এক্সপোর কমিশনার জেনারেল অ্যানেম্যারি জরিটসমা বক্তব্য রাখেন। পরে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আম উৎসবের উদ্‌বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের আম অত্যন্ত সুস্বাদু ও সম্ভাবনাময়। এ আমের রপ্তানির সম্ভাবনাকে আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাই। বাংলাদেশের আমকে ইউরোপসহ বিশ্ববাজারে নিয়ে যেতে চাই। এলক্ষ্যে এই আম উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের আম আরও জনপ্রিয় হবে ও আমের রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়া আমরা বাংলাদেশের রপ্তানিকে বহুমুখী করতে চাই, এক্ষেত্রে আম রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব।

পদ্মা সেতুর কারণে বেড়েছে কৃষিতে সম্ভাবনা

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের পর উন্মুক্ত হয়েছে ঝালকাঠির সঙ্গে সড়কপথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের বাণিজ্যিক পথ। বিশেষ করে জেলার কৃষি খাতে বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। স্বপ্নের দ্বার উন্মোচিত হওয়ায় কৃষকরা পাচ্ছেন তাদের পণ্যের ন্যায্য মূল্য। ঝালকাঠি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বোরো ধানের উৎপাদন ৫১ হাজার ৮২৯.৪৫৮ মেট্রিক টন। শীতকালীন সবজি ৮ হাজার ৩৪৬ হেক্টর জমিতে ১ লাখ ৬০ হাজার ৬৬০.৫ মে.টন উৎপাদন হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জেলায় দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফল হিসেবে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে প্রায় ৯০০০ মে.টন আমড়া উৎপাদন হয়। পাশাপাশি প্রায় ৯০০ হেক্টর জমিতে প্রায় ১০ হাজার মে.টন পেয়ারা উৎপাদন হয়। এছাড়া ১ হাজার ১৫০ হেক্টর জমিতে ১০ হাজার ৩৫০ মে.টন নারিকেল উৎপাদন হয়। এছাড়া সরিষা ২২২.৭৫ মে.টন, গম ৪৭৮.৫ মে.টন, ৫ হাজার ৪ মে.টন ভুট্টা, ১২ হাজার ৮১২ মে.টন ডাল উৎপাদন হয় এ জেলায়। উৎপাদিত এসব সবজি, ধান ও রবি শষ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রির সুযোগ না থাকায় বাধ্য হয়ে পাইকারদের কাছে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে হতো কৃষকদের। কিন্তু এখন পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্যার সমাধান হওয়ায় কৃষকরা বেশি লাভবান হচ্ছে। কৃষকরা জানায়, সেতু চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এসব কৃষিপণ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে ঢাকায় সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। সেখান থেকে সরাসরি চলে যাবে চাহিদাভিত্তিক অঞ্চলে।

কাঁঠালিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. বশির ২১শে জুলাই সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টের (এসএসিপি) মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ঢাকায় বিক্রির উদ্যোগ নিচ্ছি। মাঠপর্যায়ে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করে কৃষকদের সমিতির মাধ্যমে ঢাকায় বিক্রি করা হবে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২২

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বর্তমানে দেশে বনের পরিমাণ ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। আমাদের প্রয়োজন ২৫ শতাংশ বনায়ন। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বনায়নের যে লক্ষ্য, তা অর্জনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত পাহাড় ও বনের

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বন অধিদপ্তরে 'জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২২'-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার উপস্থিত ছিলেন – পিআইডি

গাছ কাটা যাবে না। তিনি এসময় টিলা কাটা ও নদী ভরাট বন্ধ করে অধিক হারে বৃক্ষরোপণের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২২-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে বন অধিদপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশে সবুজ আচ্ছাদন তৈরিপূর্বক টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রতিবছর আয়োজিত বৃক্ষমেলা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বছর শেরেবাংলা নগরস্থ মাঠে আয়োজিত জাতীয় বৃক্ষমেলায় সর্বমোট ১৬ লাখ ৩০ হাজারের বেশি চারা বিক্রি হয়েছে। দেশব্যাপী আয়োজিত এ বৃক্ষমেলায় বিক্রয় ও রোপণ করা হয় কোটি কোটি বৃক্ষ। সকলের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে বনের জবরদখল উচ্ছেদ, বৃক্ষহীন ও অবক্ষয়িত বনভূমি, প্রান্তিক ভূমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, ২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত ম্যানগ্রোভসহ ১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭৮ হেক্টর ব্লক, ২৬ হাজার ৪৫৩ সিডলিং কিমি. স্ট্রিপ বাগান সৃজন এবং বিক্রয়-বিতরণের ১০ কোটি ৫৯ লাখ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। একই সময়ে সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত ১ লাখ ৪১ হাজার ২৩৮ জন উপকারভোগীর মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৩ বছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪ হাজার ৭২৯ হেক্টর বনভূমি জবরদখল মুক্ত করে বনায়ন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৯ ও ২০২০' এবং সামাজিক বনায়নের ৬ জন উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের ৩৭ লাখ টাকার চেক, নির্বাচিত স্টল মালিকদের এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

এবারের জাতীয় বৃক্ষমেলায় মোট স্টল ছিল ১১০টি। এর মধ্য ৮০টি স্টলে ৬৩টি ব্যক্তি-মালিকানাধীন নার্সারি, ১৫টি স্টলে ৩৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, ৬টি স্টলে ৪টি বেসরকারি সংস্থা এবং ৯টি স্টলে ২টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। বৃক্ষমেলায় মোট ১২ কোটি ৪২ লাখ ৩০ হাজার ২৪২ টাকার চারা বিক্রয় হয়।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

নভেম্বরের পর বন্ধ হচ্ছে করোনা টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ কার্যক্রম

সরকার নভেম্বরের পরে আর কোনো ব্যক্তিকে করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের টিকা দেবে না। এরপর থেকে বুস্টার বা তৃতীয় ডোজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিরাই টিকা পাবেন। এর বাইরে টিকা পাবে শুধু ৫ থেকে ১১ বছর বয়সি শিশুরা। ২৫শে জুলাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে এখনো প্রায় দেড় কোটি টিকা মজুত আছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা এসব টিকার ব্যবহারের মেয়াদ নভেম্বরে শেষ হবে। কোনো টিকা ২১, কোনো টিকা ২৩, কোনো টিকা ৩০শে নভেম্বরের পর আর ব্যবহার করা যাবে না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের টিকা কমিটি বলছে, এখনো যারা প্রথম ডোজ টিকা নেননি, তারা দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার সময় পাবেন না। তবে বুস্টার ডোজ নভেম্বরের পরও দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, সরকার ইতোমধ্যে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে।

মাঙ্কিপক্স নিয়ে ডব্লিউএইচও-র জরুরি সতর্কতা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি সতর্কতা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও। ২৩শে জুলাই ডব্লিউএইচও-র জরুরি কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক শেষে এ ঘোষণা দেন সংস্থাটির প্রধান তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস।

বৈশ্বিক স্বাস্থ্যগত জরুরি সতর্কতা ঘোষণা হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউএইচওপ্রধান বলেন, এখন পর্যন্ত ৭৫ দেশে ১৬ হাজারের বেশি মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই মাঙ্কিপক্সের সংক্রমণকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সতর্কতা হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি সারা বিশ্বের জন্য উদ্বেগের। করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই উত্তর আমেরিকা-ইউরোপসহ বেশ কয়েকটি দেশে মাঙ্কিপক্সের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী শনাক্ত হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশব্যাপী ঈদ উপলক্ষে মহাসড়কে যান চলাচলে বিধিনিষেধ

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ঈদ যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ৩রা জুলাই এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুমোদিত এলাকার বাইরে মোটরসাইকেল রাইড-শেয়ারিং করা যাবে না এবং পবিত্র ঈদুল আজহার আগের তিন দিন, ঈদের দিন এবং ঈদের পরের তিনদিন সারা দেশের মহাসড়কে যৌক্তিক কারণ ছাড়া মোটরসাইকেল চালানো যাবে না। পাশাপাশি এক জেলায় রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরসাইকেল অন্য জেলায় চালানো যাবে না। তবে যৌক্তিক ও অনিবার্য প্রয়োজনে পুলিশের অনুমতি নিয়ে মোটরসাইকেল চালানো যাবে।

নিত্যপণ্য, কাঁচামাল, ওষুধ, জ্বালানি তেল, গার্মেন্টস সামগ্রী, রপ্তানি পণ্য, পচনশীল দ্রব্য ও পশুবাহী ট্রাক ছাড়া ভারী পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান এবং লরি ঈদের আগের তিন দিন, ঈদের দিন এবং ঈদের পরের তিনদিন সারা দেশের মহাসড়কে চলাচল নিষিদ্ধ। এ নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, মহাসড়কের উপর পশুর হাট বসানো যাবে না। এসময় তিনি ফিটনেসবিহীন গাড়িতে কোরবানির পশু পরিবহণ না করার জন্য পরিবহণ মালিক-শ্রমিকদের অনুরোধ জানান। সেইসঙ্গে সিএনজি ফিলিং স্টেশন সার্বক্ষণিক খোলা রাখার বিষয়ে উদ্যোগ নিতেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। পোশাক শ্রমিকদের পর্যায়ক্রমে ছুটি দেওয়ার জন্য তিনি বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-এর নেতৃবৃন্দদের প্রতিও আহ্বান জানান।

এসময় মন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় অনেক পশুবাহী যানবাহন এ পথে ঢাকায় আসবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সড়কে যানবাহনের চাপ বাড়বে। এ চাপ মোকাবিলায় পদ্মা সেতু ও এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজাসহ বঙ্গবন্ধু সেতু, মেঘনা এবং গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় বুথ সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। গণপরিবহণে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

বিদ্যুৎ : বিশেষ প্রতিবেদন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ১৪ নির্দেশনা

চলমান বৈশ্বিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ সাশ্রয়ে ১৪ দফা নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ২৫শে জুলাই এনবিআর ও এর অধীন সব দপ্তরকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এনবিআর এক আদেশে জানায়, চলমান বৈশ্বিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বিদ্যুৎ খাতে ২৫ শতাংশ এবং জ্বালানি খাতে ২০ শতাংশ খরচ সাশ্রয়ে এই মিতব্যয়িতা চর্চার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে– অফিস কক্ষে অবস্থান না করলে কক্ষের বৈদ্যুতিক পাখা, বাতি, এসি, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্র বন্ধ নিশ্চিত করা; বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারে সর্বোচ্চ মিতব্যয়িতা নিশ্চিত করা; অফিস কক্ষ, অফিস করিডর, সম্মেলন কক্ষসহ অন্যান্য স্থানে অনাবশ্যক বাতি না জ্বালানো; এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না রাখা; অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করা; গাড়ির জ্বালানি খরচ কমানোর জন্য গাড়িতে এসির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা; গাড়ির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার পরিহার করা; গাড়ির জ্বালানি বাবদ খরচ বিদ্যমান খরচ থেকে ২০ শতাংশ

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম ১৮ই জুলাই ২০২২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন। এসময় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

কমানোর লক্ষ্যে অফিসপ্রধানের নিয়মিত তদারকি করা; সব সভা যত দূর সম্ভব অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা; এনবিআরের কর্মচারীদের অত্যাবশ্যক না হলে বিদেশে ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করা; দাপ্তরিক কাজে কাগজসহ সরঞ্জামাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা (যেমন: কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় প্রিন্ট করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রিন্ট পরিহার করতে হবে)। উত্তরণের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সুবিধাসমূহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে আলাপ-আলোচনা বা নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়ায় আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

মনপুরা দ্বীপের জন্য হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২৫শে জুলাই বিদ্যুৎ ভবনে মনপুরা দ্বীপের জন্য তিন মেগাওয়াট সোলার-ব্যাটারি-ডিজেল সংবলিত হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি হয়। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) ও ওয়েস্টার্ন মনপুরা সোলার পাওয়ার লিমিটেড (ডব্লিউএমএসপিএল)-এর সাথে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটিতে Implementation Agreement (IA)-এ বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে যুগ্মসচিব নিরোদ চন্দ্র মণ্ডল ও Power Purchase Agreement (PPA)-এ ওজোপাডিকোর সচিব মো. আলমগীর কবির এবং ডব্লিউএমএসপিএল-এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বশির আহমেদ স্বাক্ষর করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিদ্যুৎ সচিব মো. হাবিবুর রহমান বলেন, আগামী দিনের জ্বালানি হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি। নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে সরকার নানাভাবে সহযোগিতা করছে। মনপুরার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে সোলারের সাথে ব্যাটারি এবং ডিজেল থাকবে। তবে কোনো অবস্থায় ডিজেল থেকে ১০ ভাগ বিদ্যুতের বেশি উৎপাদন করা যাবে না।

২০ বছর মেয়াদি এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ হাজার কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। মনপুরা দ্বীপের ২০ হাজার ৪৮৩ জন গ্রাহক সরকারি মূল্যে তথা BERC-এর রেটে বিদ্যুৎ সুবিধা পাবে। ফলে উক্ত দ্বীপে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পায়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

দুই রুটে ২০০ টাকা করে ভাড়া কমাচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর যাত্রী সংকটের মুখে ঢাকা-বরিশাল এবং ঢাকা-যশোর রুটে উড়োজাহাজের ভাড়া কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এ দুটি রুটে ২০০ টাকা করে ভাড়া কমানো হবে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঢাকা-বরিশাল রুটে তিন হাজার টাকা এবং ঢাকা-যশোর রুটে তিন হাজার ২০০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। শিগগির এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে। ভাড়া কমানোর সিদ্ধান্তের বিষয়টি ২৬শে জুলাই সংবাদ মাধ্যমকে নিশ্চিত করেন বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা খন্দকার। ঢাকা-বরিশাল রুটের বরিশাল সেলস কাউন্টার: ০২৪৭৮৮৬৫০১৯, জেলা ব্যবস্থাপক (বরিশাল): +৮৮০১৭৭৭৭৭৫৫৩০ ও বিমান কল সেন্টার: +৮৮০১৯৯০৯৯৭৯৯৭ নম্বরে কল দিয়ে টিকিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এছাড়া ঢাকা-যশোর রুটের টিকিট কিনতে ০১৯৯০৯৯৭৯৯৭ নম্বরে কল দিতে হবে।

এক্সপ্রেসওয়ে-মেট্রোতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন কাওলা এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের একটি লুপ নেমে গেছে বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন তৃতীয় টার্মিনালে। টার্মিনালের প্রথম গেট এলাকায় আবার খোঁড়াখুঁড়ির কাজও চলছে। এখানে নির্মাণ করা হচ্ছে টানেল। এই টানেল গিয়ে মিলবে বিমানবন্দরের অদূরে অবস্থিত মেট্রোরেলের স্টেশনে। সবগুলোর নির্মাণ শেষ হলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আর মেট্রোরেলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে বিমানবন্দর। ফলে বিদেশ থেকে যেসব যাত্রী আসবেন তারা খুব সহজেই বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যেতে পারবেন। আবার যারা বিদেশ যাবেন তারাও রাজধানীর যানজট এড়িয়ে খুব সহজে চলে যেতে পারবেন বিমানবন্দরে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে সরাসরি চলে যাওয়া যাবে নির্মিতব্য নতুন টার্মিনালে। এ কারণেই বিমানবন্দর এলাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে টার্মিনালে নামার জন্য রাখা হচ্ছে আলাদা ব্যবস্থা। ঠিক একই পথ ব্যবহার করে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েও যাওয়া যাবে।

এক্সপ্রেসওয়ে এবং থার্ড টার্মিনালের সংযোগ দৃশ্যমান হয়েছে। এরই মধ্যে পিলারের ওপর বসেছে স্প্যান। একটি লুপ কাওলা থেকে বিমানবন্দরে নেমে গেছে। অন্যদিকে টানেল নির্মাণকাজও চলমান। আরও বড়ো চমক হলো বিমানবন্দর থেকে পাতালরেলে খিলক্ষেত হয়ে কাওলা যাওয়া যাবে। সেখানে নেমে সুড়ঙ্গপথে চলে যাওয়া যাবে তৃতীয় টার্মিনালে। কাওলা স্টেশনকে তৈরি করা হচ্ছে শুধু হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে যাওয়ার জন্য। অন্যদিকে মেট্রোরেল-১ হচ্ছে কমলাপুর থেকে শুরু হয়ে রাজারবাগ-মালিবাগ-রামপুরা, যমুনা ফিউচার পার্ক, খিলক্ষেত হয়ে বিমানবন্দর পর্যন্ত। এটি পুরোটাই

পাতালরেল। কাওলা স্টেশন থেকে ২০০ মিটারের একটি টানেলের কাজ চলমান। একইসঙ্গে বিমানবন্দর থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে উঠার জন্য সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজও চলছে। জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে থার্ড টার্মিনালের কাজ সমাপ্ত হবে আশা করা যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

অনলাইনে প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম চালু

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলিকে সহজ করতে অনলাইনে শিক্ষক বদলির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২৭শে জুলাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বদলি কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। গত ৩০শে জুন গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এ কার্যক্রমের পাইলটিং উদ্‌বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। ১৫ই জুলাই পর্যন্ত যেসব শিক্ষকগণ বদলির আবেদন করেছেন তাদেরকে বদলির আওতায় আনা হবে। পাইলটিং কার্যক্রম শেষ হলে সারা দেশে সহকারী শিক্ষকদের অনলাইনে বদলির কার্যক্রম শুরু হবে।

পরীক্ষামূলকভাবে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে নতুন পদ্ধতিতে ১৮টি বিদ্যালয়ে শূন্য পদে বদলি করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নতুন এই পদ্ধতিতে আগামী মাস (আগস্ট) থেকে সারা দেশে বদলির কাজ শুরু করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। তবে ঢাকাসহ ১১টি মহানগরে বদলির এই কার্যক্রম আপাতত বন্ধ থাকবে।

জুনিয়র অডিটরের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৮৮৪ জন

হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের ১৬তম গ্রেডভুক্ত জুনিয়র অডিটরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে ২৯শে জুলাই। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ৮৮৪ জন। এসব প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সিজিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ২২শে জুলাই সকাল ১০টায় জুনিয়র অডিটর পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

পূবালী ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে অনলাইনে আবেদন

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার সমমানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (ইইই) বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ/সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইলেকট্রিক্যাল কাজে বাজেট ও এস্টিমেশন, ইলেকট্রিক পণ্য কেনা, লিফট ও জেনারেটর ইনস্টলিং ও কমিশনিং, সাবস্টেশনের যন্ত্রপাতি, এয়ারকুলার, পিএবিএক্স ও সিসিটিভি সিস্টেমের কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যারের কাজ জানতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সাবলীল হতে হবে। বয়স: ২০২২ সালের ৩০শে জুন সর্বোচ্চ ৩০ বছর। বেতন ও সুযোগ-সুবিধা: সিনিয়র অফিসার হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের পূবালী ব্যাংকের ওয়েবসাইটের লিংকে গিয়ে ফরম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। এই লিংকে পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। ২৫শে আগস্ট ২০২২ আবেদনের শেষ সময়।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ফিরোজা বেগম স্মৃতিপদক প্রদান ২০২২

নজরুল সংগীতের সঙ্গে আমৃত্যু বন্ধন ছিল ফিরোজা বেগমের জীবনের সুরটি। আপন সাধনা ও মেধার স্ফুরণে নজরুলের গানকে পৌঁছে দিয়েছেন অনন্য উৎকর্ষতায়। কিংবদন্তি সেই শিল্পীর নামাঙ্কিত পদক অর্জন করলেন বরেণ্য দুই কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান ও সৈয়দ আব্দুল হাদী। ২৭শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিলেট ভবন

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ২৯শে জুলাই ২০২২ ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের আগরতলা থেকে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আয়োজনে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান। একই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিএপ্রাপ্ত দুই শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড এই স্মৃতিপদক প্রদান করে। প্রখ্যাত এই শিল্পীর জীবন ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২০১৬ সাল থেকে ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। করোনার কারণে দুই বছর বন্ধ থাকায় এবছর একইসঙ্গে ২০২০ সালের জন্য বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমান ও ২০২১ সালের জন্য সৈয়দ আব্দুল হাদীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

ফকির আলমগীর স্মরণোৎসব

গণসংগীতের সমান্তরালে মিশে আছে ফকির আলমগীরের নাম। দেশের গণসংগীতের ম্রিয়মাণ ধারাটি গতি পেয়েছে তাঁর মতো শিল্পীর কারণে। দেশের গণসংগীতের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত তাঁর মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি কোনো গণসংগীত শিল্পী। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। যে-কোনো অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ছিলেন রাজপথের নির্ভীক যোদ্ধা– স্মরণানুষ্ঠানে এভাবেই বরেণ্য শিল্পী ফকির আলমগীরের বর্ণিল জীবনের মূল্যায়ন করেন বিশিষ্ট জনেরা। শিল্পীর প্রথম প্রয়াণ দিবসে ২রা জুলাই শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে কথা ও গানে ফকির আলমগীরকে স্মরণ শীর্ষক অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদ। এ আয়োজনে গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কাজী মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেমা হলে গলুই

প্রথমবারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহে শাকিব খানের চলচ্চিত্র *গলুই* প্রদর্শিত হয়। ১৫ই জুলাই নিউইয়র্কের জামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পায় চলচ্চিত্রটি। এ চলচ্চিত্রের পরিচালক এস এ হক অলিক। এ চলচ্চিত্রে শাকিব খানের বিপরীতে আছেন পূজা চেরী। ২১শে জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন চারটি করে মোট ২৮টি শো চলে প্রথম ধাপে। এছাড়া মাসব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়। সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্রটি গত ঈদুল ফিতরে মুক্তি পেয়েছিল।

টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২২

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সেবীদের নিয়ে ১৮ই জুলাই টরন্টো ফিল্ম ফোরাম আয়োজিত ৫ম টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২২ শুরু হয়। টরন্টো শহরের তিনটি স্থানে ছয় দিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র, পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীসমূহ টরন্টোর মূলধারার প্রেক্ষাগৃহে (সিনেপ্লেক্স এগলিনটন ও ফক্স থিয়েটার, কুইনস্ট্রিট ইস্ট), টরন্টো মাল্টিকালচারাল ফিল্ম সেন্টার এবং অনলাইনে প্রদর্শিত হয়। বিকাল ছয়টায় স্কারবরোর এগলিনটন টাউন সেন্টারের ২২ লেবোভিক এভিনিউর সিনেপ্লেক্সে ওডেনে উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান হয়। এক ঘণ্টার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান শেষে বিকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়। চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথমদিনে কানাডা, ইউক্রেন, ইরান, ইতালি, গ্রিস, তিউনিসিয়া এবং বাংলাদেশের সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনি চলচ্চিত্র, একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র এবং একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। জুলাই ১৯, ২০, ২১ এবং ২২ তারিখে বিকাল পাঁচটা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শন হয় ৩০০০ ড্যানফোর্থ এভিনিউর মাল্টিকালচারাল ফিল্ম স্ক্রিনিং সেন্টারে। ২৩শে জুলাই সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ২২৩৬ কুইনস্ট্রিটইস্টের ঐতিহ্যবাহী ফক্স থিয়েটারে। সমাপনী অনুষ্ঠানের পূর্বে দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে ৪৯টি দেশের স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মোট ১৩৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুদানের চেক হস্তান্তর

চলচ্চিত্র নির্মাণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক অনুদানের প্রথম কিস্তির চেক বিতরণ হয়েছে। ২০শে জুলাই মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিত ১৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রস্তাবকদের হাতে চেক তুলে দেন। স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগে এবার ২টি প্রামাণ্যচিত্র রয়েছে। প্রথম কিস্তি হিসেবে প্রতিটি চলচ্চিত্রের জন্য মঞ্জুর হওয়া মোট অনুদানের ৩০ শতাংশ বিতরণের এ অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রখ্যাত সারা যাকের, মারুফা আক্তার পপি, অপু বিশ্বাস, সৈয়দ আলী হায়দার রিজভী এবং ছোটকু আহমেদ তাদের সিনেমার জন্য চেক গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদককে 'না' বলো

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক নির্মূলে সরকার বদ্ধপরিকর

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, মাদক নির্মূলে সরকার বদ্ধপরিকর। যারা এখনও এ পেশায় আছেন তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না এলে তাদের করুণ পরিণতি হবে। আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। ১৯শে জুলাই বগুড়া জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ লাইনস মাঠে সন্ত্রাস ও মাদকবিরোধী সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অতীতে যেভাবে সহিংসতা ও নাশকতা নির্মূল করা হয়েছে, তেমনিভাবে যে-কোনো ধরনের সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান দৃঢ়। মাদক ও সন্ত্রাস দমনে জিরো টলারেন্স ঘোষণাসহ সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা এখনও মাদক ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। অন্যথায় করুণ পরিণতি হবে। আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলে সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। তিনি আরও বলেন, আমরা মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে চাই। আমাদের এই প্রজন্ম যদি পথ হারিয়ে ফেলে তাহলে দেশের স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন থাকবেন ততদিন বাংলাদেশ আলোকিত থাকবে। শেখ হাসিনার হাতকে আরও

শক্তিশালী করতে এবং মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূল করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সমাবেশ শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৫০ জন পুরুষকে একটি করে ভ্যান ও ১৫ জন নারীকে একটি করে সেলাই মেশিন হস্তান্তর করেন।

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, মাদকসেবী ও কারবারিদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৬ই জুলাই পোরশা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে বা সাজা দিয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। যার যার অবস্থান থেকে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, জেলা বা উপজেলা আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মী মাদক কারবারির পক্ষে সুপারিশ করতে পারবেন না। যদি কোনো নেতাকর্মী কোনো মাদক ব্যবসায়ীর পক্ষে সুপারিশ করতে যান তাহলে ওই মামলার চার্জশিটে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন তিনি। সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, আগামী প্রজন্মকে মাদকের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে একটি সুস্থ জাতি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে পরিবার থেকেই আন্দোলন শুরু হওয়া দরকার। মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একসঙ্গে কাজ করারও আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা বেশি

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী, দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫৯। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা কিছুটা বেশি। জনশুমারিতে দেশের ৫০টি জাতিসত্তার জনসংখ্যা তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ২৭শে জুলাই এ প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারীর সংখ্যা ৮ লাখ ২৫ হাজার ৪০৮। আর পুরুষের সংখ্যা ৮ লাখ ২৪ হাজার ৭৫১ জন। বিভাগ অনুযায়ী, বরিশালে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী জনসংখ্যা ৪ হাজার ১৮১ জন, চট্টগ্রামে ৯ লাখ ৯০ হাজার ৮৬০, ঢাকায় ৮২ হাজার ৩১১, খুলনায় ৩৮ হাজার ৯৯২, ময়মনসিংহে ৬১ হাজার ৫৫৯, রাজশাহীতে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৫৯২, রংপুরে ৯১ হাজার ৭০ ও সিলেটে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৫৯৪ জন।

৫০টি জাতিসত্তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠী চাকমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ৪ লাখ ৮৩ হাজার ২৯৯। সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামেরই দুই জাতিগোষ্ঠী মারমা ও ত্রিপুরা। মারমাদের সংখ্যা ২ লাখ ২৪ হাজার ২৬২ আর ত্রিপুরাদের সংখ্যা ১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৭৮। চতুর্থ স্থানে আছে সমতলের জাতিগোষ্ঠী সাঁওতাল। তাদের সংখ্যা ১ লাখ ২৯ হাজার ৪৯ জন।

জেলার নিরিখে দেশে রাঙামাটিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ জেলায় এসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা ৩ লাখ ৭২ হাজার ৮৬৪। এরপরই আছে পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি। এখানে জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৩৭৮।

বান্দরবানে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্‌বোধন

'নিরাপদ মাছে ভরব দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'–এই স্লোগানে বান্দরবানে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। ২৭শে জুলাই বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পাঁচজন মৎস্য চাষিকে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশুদের জন্য দেশে এল বিশেষ টিকা

দেশে ৫ থেকে ১১ বছর বয়সি শিশুদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ফাইজারের করোনাভাইরাসের ১৫ লাখের বেশি ডোজ টিকা ৩০শে জুলাই ২০২২ ঢাকায় এসেছে। স্কুলগুলোতে কেন্দ্র করে শিশুদের এই বিশেষ টিকা দেওয়া হবে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)। স্কুলে দেওয়ার পর কমিউনিটিতে যেসব শিশু আছে, যারা স্কুলে আসে না, তাদের জন্য ক্যাম্পেইন করে টিকা দেওয়া হবে।

সাজার বদলে শিশুর হাতে বই ও কলম

সুনামগঞ্জে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক মো. জাকির হোসেন এক ব্যতিক্রমী রায় দিয়েছেন। ২০শে জুলাই ৫২টি মামলায় ৬৫ জন শিশু-কিশোরকে কারাগারে না পাঠিয়ে হাতে তুলে দিয়েছেন বই, জাতীয় পতাকা, ফুল, কলম ও ডায়েরি।

সুনামগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল সূত্রে জানা গেছে, মারামারি, চুরিসহ নানা অভিযোগে ৫২টি মামলায় ৬৫ জন শিশু-কিশোর পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে আসামি করা হয়েছিল। তারা দীর্ঘদিন ধরে আদালতের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করত। মানসিকভাবে তারা বিপর্যস্ত ছিল। শিশুদের পড়ালেখা ও স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছিল। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিচারক জাকির হোসেন মামলাগুলো নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেন। তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মামলাজট শেষ করতে ২০শে জুলাই একসঙ্গে ৫২টি মামলার রায় দেন। লঘু অপরাধে অনেক শিশুর শাস্তি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এক বছরের প্রবেশনে মা-বাবার জিম্মায় মুক্তির রায় দেওয়া হয়। প্রবেশনকালে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা, কম্পিউটার, গবাদি পশুসহ বৃত্তিমূলক যে-কোনো একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ, প্রতিদিন দুটি ভালো কাজ করে ডায়েরিতে লিখে রাখা, প্রত্যেককে ২০টি করে গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা করা, নিয়মিত ধর্মকর্ম পালনসহ মা-বাবার আদেশ মেনে চলা এবং মাদক থেকে দূরে থাকার শর্ত দেওয়া হয়। এই শর্তগুলো পালন হয় কি না, তা দেখার জন্য সুনামগঞ্জ জেলা প্রবেশন কর্মকর্তা মো. শফিউর রহমানকে প্রতি তিন মাস পর পর আদালতে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন কারও ওপর নির্ভরশীল না থাকে, সেলক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থান ও আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ১৬ই জুলাই সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন প্রকল্পের লালমনিরহাট কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পর্যায়ক্রমে ভাতা বাড়ানো হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও আবাসস্থল তৈরি করা হবে, যাতে তারা কারও ওপর নির্ভরশীল না থাকে। এছাড়া শান্তি নিবাস স্থাপন প্রকল্প প্রসঙ্গে মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, শান্তি নিবাসে ষাটোর্ধ্ব বয়সের মানুষেরা থাকতে পারবেন। আর শিশু পরিবারের শিশুরা তাদের দাদা-দাদি বা নানা-নানি হিসেবে যত্ন নেবেন।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মেধা-মনন বিকাশে সমন্বিত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, যে-কোনো স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় এ ধরনের শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খোলামেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৩ই জুলাই গণভবনে প্রধানমন্ত্রী দেশের অটিজম ও এনডিডি (নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটিজ) শিশুদের শিক্ষার ন্যায্য ও সমঅধিকার নিশ্চিতকল্পে নির্মিতব্য আন্তর্জাতিক মানের একটি ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটিজের (এনএএএনডি) স্থাপত্য নকশার উপস্থাপনা অবলোকনকালে এ কথা বলেন। পিএমওর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই জুলাই ২০২২ গণভবনে 'ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটিজের (এনএএএনডি) কমপ্লেক্স'-এর স্থাপত্য নকশার উপস্থাপনা অবলোকন করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শহর এলাকায় যে-কোনো আবাসিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'ক্রস ভেন্টিলেশন' ব্যবস্থা নিশ্চিতে তাঁর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী এসময় অটিজম ও এনডিডি শিশুদের জন্য বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং নতুন নতুন শিক্ষক ও প্রশিক্ষক সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। কমপ্লেক্স ভবনের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি দিনের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার, মুক্ত বায়ু/অক্সিজেন চলাচল, প্রয়োজনীয় জলাধার সংরক্ষণ, যথাযথ অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত উন্মুক্ত স্থান রাখার ওপর জোর দেন। এসময় শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আবু বকর সিদ্দিক অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকায় সাফ কংগ্রেস

প্রতিবছর বার্ষিক কংগ্রেসের আয়োজন করে থাকে দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সাফ)। তবে এবার ভারত ও পাকিস্তানকে ছাড়াই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে সংস্থাটির বার্ষিক কংগ্রেস। এরই মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগামী চার বছরের জন্য সাফ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কাজী সালাউদ্দিন। ২০০৯ সালে প্রথমবার সাফের সর্বোচ্চ অভিভাবক নির্বাচিত হন সালাউদ্দিন। তখন থেকে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন সাবেক এই ফুটবলার।

ক্যারিবিয়দের হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ

ওয়ানডেতে টাইগারদের সামনে পাত্তাই পেল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ১৭ই জুলাই ম্যাচে সব উইকেট হারিয়ে ১৭৮ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষটিতে ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ৬ ও দ্বিতীয়টিতে জয় পেয়েছিল ৯ উইকেটে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ওয়ানডেতে হোয়াইটওয়াশ করল বাংলাদেশ।

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক বাংলাদেশ

২০২৪ সালের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে বাংলাদেশের নাম ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। ২৬শে জুলাই বার্ষিক সাধারণসভা শেষে আগামী চারটি বৈশ্বিক আসরের আয়োজকদের নাম ঘোষণা করেছে তারা। ২০২৫ সালে নারীদের বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। এর পরের বছর ২০২৬ সালে নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ইংল্যান্ডে এবং ২০২৭ সালে নারীদের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে শ্রীলঙ্কা।

টানা দুই ম্যাচে বাংলাদেশের দারুণ জয়

দুই দেশের যুব দলের ম্যাচ হলেও উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছিল ভালোই। কখনও কখনও মনে হচ্ছিল মাঠে খেলছে বাংলাদেশ-ভারত জাতীয় দল। দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ে ২৭শে জুলাই ভারতকে ২-১ গোলে হারিয়ে দারুণ এক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। জোড়া গোল করে বাংলাদেশের জয়ের নায়ক পিয়াস আহমেদ। প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়। দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলের ফাইনালের আশা উজ্জ্বল করেছে বাংলাদেশের যুবারা।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলম খান চলে গেলেন

আফরোজা রুমা

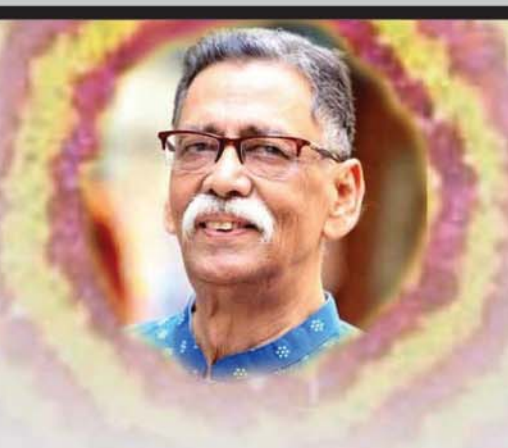

বাংলা গানের কিংবদন্তি সুরকার, সংগীত পরিচালক ও গীতিকার আলম খান চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। ৮ই জুলাই ঢাকার শ্যামলীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

আলম খান সিরাজগঞ্জের বানিয়াগাতি গ্রামে ১৯৪৪ সালের ২২শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আফতাব উদ্দিন খান ছিলেন সেক্রেটারিয়েট হোম ডিপার্টমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ও মা জোবেদা খানম। আলম খান পপ সম্রাটখ্যাত আজম খানের বড়ো ভাই ছিলেন।

বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে আলম খানের শৈশব কেটেছে কলকাতায়। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর ঢাকায় ফিরে থিতু হন তাঁরা। ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকে সুর আর গানের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে আলম খানের। প্রথমদিকে বাবার আপত্তি থাকলেও মায়ের উৎসাহে চলে সংগীতচর্চা। পরে ছেলের গানের প্রতি তীব্র ঝোঁক দেখে বাবাই তাঁকে সংগীতে তালিমের জন্য নিয়ে যান ওস্তাদ ননী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ষাটের দশকের শুরুর দিকে সুরকার ও সংগীত পরিচালক রবিন ঘোষের সহকারী হিসেবে *তালাশ* সিনেমার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন আলম খান। ১৯৭০ সালে *কাচ কাটা হীরে* সিনেমায় সংগীত পরিচালক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন তিনি, তবে শুরুতে সাফল্য ধরা দেয়নি এই সুরকারের জীবনে। নাট্যকার, নির্দেশক আবদুল্লাহ আল মামুনের *সারেং বৌ* সিনেমায় 'ওরে নীল দরিয়া' গানের সুরে বাজিমাত করেন আলম খান, বনে যান কিংবদন্তি। তাঁর সুরে আব্দুল জব্বারের গাওয়া গানটি এখনও জনপ্রিয়। ১৯৮২ সালে *রজনীগন্ধা* সিনেমায় আলম খানের সুরে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে 'আমি রজনীগন্ধা ফুলের মতো' এবং *বড় ভালো লোক ছিল* চলচ্চিত্রে সৈয়দ শামসুল হকের লেখা এন্ড্রু কিশোরের কণ্ঠে 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস', *ভেজা চোখ* চলচ্চিত্রে এন্ড্রু কিশোরের কণ্ঠে 'জীবনের গল্প আছে বাকি অল্প', *নাগ পূর্ণিমা* চলচ্চিত্রে এন্ড্রু কিশোরের কণ্ঠে রক ধাঁচের 'তুমি যেখানে আমি সেখানে' গানগুলো শ্রোতাপ্রিয়তা লাভ করে। এ সুরস্রষ্টা শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন– 'ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে', 'কি জাদু করিলা পিরিতি শিখাইলা', 'সবাই তো ভালোবাসা চায়', 'আমি একদিন তোমায় না দেখিলে', 'তেল গেলে ফুরাইয়া', 'আমি তোমার বধূ তুমি আমার স্বামী', 'মনে বড় আশা ছিল', 'সাথিরে যেও না কখনো দূরে', 'বেলি ফুলের মালা পরে', 'কাল তো ছিলাম ভালো', 'চুমকি চলেছে একা পথে', 'ভালবাসিয়া গেলাম ফাঁসিয়া', 'তুমি কি এখন আমারই কথা ভাবছো', 'আকাশেতে লক্ষ তারা চাঁদ কিন্তু একটারে'–এমনি সব জনপ্রিয় গান।

আলম খান মোট ছয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। পুরস্কারগুলো হলো– শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক চলচ্চিত্র *বড় ভালো লোক ছিল* (১৯৮২), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক চলচ্চিত্র *সারেন্ডার* (১৯৮৭), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক চলচ্চিত্র *দিনকাল* (১৯৯২), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক চলচ্চিত্র *এবাদত* (২০০৯) ও শ্রেষ্ঠ সুরকার 'কি যাদু করিলা' (২০১০)। আরও পেয়েছেন বাচসাস চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি পুরস্কার।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলম খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, এই বরেণ্য সংগীত ব্যক্তিত্ব বাংলা সংগীত অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন। চলচ্চিত্র সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

বাংলা গানের কিংবদন্তি সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলম খানের মরদেহ ৮ই জুলাই আসরের নামাজের পর এফডিসিতে জানাজা শেষে ৯ই জুলাই শ্রীমঙ্গলে স্ত্রীর পাশে শায়িত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 02, August 2022, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd